Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ফজিলত ও মাসআলা মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা

রোলঃ 23090120371

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ফজিলত ও মাসআলা মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা

রোলঃ 23090120371

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব ফজিলত ও মাসআলা মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা, আইডিঃ 23090120371 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ফজিলত ও মাসআলা মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Ayesha

(স্বাক্ষর)

আয়েশা

আইডিঃ 23090120371

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	**৮**
অধ্যায় ১. গবেষণার পটভূমি	**১০-১২**
১.১ ভূমিকা	১০
১.২ গবেষণার পটভূমি ও তাৎপর্য	১০
১.৩ বিষয় নির্ধারণের কারণ	১০
১.৪ গবেষণার উৎস	১১
সারাংশ	১২
অধ্যায় ২. রোজা সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা	**১৩-৩০**
২.১ ভূমিকা	১৩
২.২ রোজার পরিচয়	১৩
২.৩ রোজার সংজ্ঞা	১৩
২.৪ রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস	১৫
২.৫ রমজানের রোজার সূচনা	১৫
২.৬ রোজার হুকুম	১৬
২.৭ রোজার ধরন	১৭
২.৭.১ ফরজ রোজা	১৭
২.৭.২ ওয়াজিব রোজা	১৮
২.৭.৩ সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা রোজা	১৮
২.৭.৪ মাকরুহ রোজা	২৮
২.৭.৫ হারাম রোজা	২৮
সারাংশ	২৯
অধ্যায় ৩. রোজা ও রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত	**৩১-৬৩**
৩.১ ভূমিকা	৩১
৩.২ রোজার গুরুত্ব	৩১
৩.৩ কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব	৩৩
৩.৪ রমযানের তাৎপর্য	৩৫
৩.৫ রোজার উদ্দেশ্য	৩৬
৩.৬ কুরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার উদ্দেশ্য	৩৬
৩.৭ তাকওয়া অর্জন	৩৬
৩.৮ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ	৩৭
৩.৯ আত্ম-শুদ্ধি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ	৩৭

৩.১০ পাপ থেকে বিরত থাকা ৩৭
৩.১১ ধৈর্য ও সংযম ৩৭
৩.১২ রোজার ফজিলত ৩৮
৩.১৩ রোজা রাখার শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা ৪৫
৩.১৩.১ রোজা রাখার শারীরিক উপকারিতা ৪৫
৩.১৩.২ রোজা রাখার মানসিক উপকারিতা ৪৫
৩.১৩.৩ রোজার যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা ৪৬
৩.১৪ রোজার বিশেষ ফজিলত ৫৪
৩.১৪.১ সাহরি ৫৪
৩.১৪.২ ইফতার ৫৫
৩.১৪.৩ ইফতার তাড়াতাড়ি করা: ৫৫
৩.১৪.৪ ইফতারের সময় দোয়া করা ৫৬
৩.১৫ তারাবীহ ৫৬
৩.১৫.১ তারাবিহ নামাজের পরিচয় ৫৬
৩.১৫.২ তারাবিহ নামাজের ফজিলত ৫৬
৩.১৬ মাহে রমজানে কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ৫৭
৩.১৭ রমজানের দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত ৫৮
৩.১৮ ইতিকাফ ৫৯
৩.১৮.১ ইতিকাফের নিয়ম ৬০
৩.১৮.২ ইতিকাফের ফজিলত ও উপকারিতা ৬০
৩.১৯ লাইলাতুল কদর — রমজানের শ্রেষ্ঠ রাত ৬১
সারাংশ ৬২
অধ্যায় ৪. রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ৬৪-৮৪
৪.১ রোজার মাসআলা মাসায়েল ৬৪
৪.২ রোজার নিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা ৬৪
৪.৩ রোজার নিয়ত সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা ৬৪
৪.৪ রোজার সময় সীমা ৬৫
৪.৫ সাহরীর মাসায়েল ৬৬
৪.৬ ইফতার-এর মাসায়েল ৬৬
৪.৭ যে সব কারণে রোজা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না ৬৭
৪.৮ যে সব কারণে রোজা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায় ৬৮
৪.৯ যে সব কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ৬৯
৪.১০ যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ৭০
৪.১০.১ দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস ৭০
৪.১০.২ পানাহার ৭০
৪.১০.৩ ধূমপান ৭১

৪.১০.৪ সেহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করে ৭১
৪.১১ রমজানের কাজা আদায়ের বিধান ৭১
৪.১২ যে সব কারণে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে ৭৪
৪.১৩ যে সব কারণে রোজা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে ৭৪
৪.১৪ রমযান মাসের সম্মান রক্ষার মাসায়েল ৭৫
৪.১৫ রোজার কাযার মাসায়েল ৭৫
৪.১৬ কাফফারার বিধান ৭৫
৪.১৭ রোজার ফিদইয়ার মাসায়েল ৭৬
৪.১৮ মানতের রোজার মাসায়েল ৭৭
৪.১৯ নফল রোজার মাসায়েল ৭৭
৪.২০ রোজা সংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল ৭৮
৪.২১ সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) সংক্রান্ত মাসআলা ৭৮
সারসংক্ষেপ ৮১
উপসংহার **৮৪**
তথ্যসূত্র **৮৬**

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে তাওবা করি।

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত ও পূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনের সর্ববৃহৎ বিষয় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব বিষয়ের ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে ইসলামের নীতি ও দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। উম্মতের ফুকাহা, উলামা, বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীগণ কুরআন ও হাদীস থেকে চয়ন করে এসব নীতিমালা ও দিকনির্দেশনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যেন মানুষ সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারে এবং যেন মানুষ এভাবে পূর্ণ মুসলমান হতে পারে। যার মধ্যে পূর্ণ মান্যতা থাকে সেই তো পূর্ণ মুসলমান। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের অন্তরের সব কুমন্ত্রণি ও সব মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না এবং যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কাজে তাঁর অনুগামী করেন। যেন তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দলে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। তাঁর অনুগ্রহে যেন হাসানের দিনে আমাদেরকে চিন্তাগ্রস্ত জান্নাতে তাঁর সাথে ও সে সব নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীন বান্দাদের সঙ্গে একত্রিত করেন, যাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো, রমজান মাসে সিয়াম পালন করা। এটি বান্দাকে তাকওয়া অর্জনের পথে পরিচালিত করে, আত্মসংযম শেখায় এবং আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি করে। এ মাসেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়। সওম বা রোজা তাকওয়া-পরহেযগারীর সর্বোত্তম বাহন। মহান আল্লাহ মু'মিন-মুসলমানদেরকে দুর্বল করার জন্য মাস ব্যাপী রোযা ফরয করেননি। রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর বান্দারাই বিজয় লাভ করে। ঈমানদারগণ আল্লাহর কোনো বিধানকেই অকল্যাণকর মনে করে না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৩) । রাসূলুল্লাহ (সা.) রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে বহু হাদিসে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারি-৩৮; সহিহ মুসলিম-৭৬০)। অন্য হাদিসে এসেছে- إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ "যখন রমজান মাস আসে, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।" (সহিহ বুখারি-১৮৯৯; সহিহ মুসলিম-১০৭৯) বর্তমান সময়ে অনেক মুসলমান রোজার ফজিলত সম্পর্কে জানেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ভুল করে বসেন। কেউ কেউ সাহরি বা ইফতারের নিয়ম জানেন না, কেউ অসুস্থ অবস্থায় করণীয় বুঝে উঠতে পারেন না, আবার কেউ কাযা ও কাফফারার সঠিক বিধান জানেন না। ফলে তারা না জেনে গুনাহগার হয়ে

পড়েন। এই গ্রন্থে আমরা রোজার গুরুত্ব, ফজিলত এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সহজ ভাষায় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যাতে পাঠকগণ রোজা পালনে উৎসাহিত হন, এর মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং শরীয়তের আলোকে সঠিকভাবে রোজা রাখতে সক্ষম হন।

আল্লাহ্ তাআলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এ থেকে পাঠকগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন— **আমীন**।

অধ্যায় ১. গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা

রোজাকে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে উপস্থাপন করে এর উদ্দেশ্য (তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, গুনাহ মাফ, নৈতিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি) কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সমস্যা চিহ্নিত করে বলা হয়েছে যে, রোজার ফজিলত জানা সত্ত্বেও অনেক মুসলমান প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল না জানার কারণে ভুল করেন। গবেষণার লক্ষ্য হিসেবে রোজার সঠিক বিধান পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার পটভূমি ও তাৎপর্য

রমজান ও রোজা ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, গুনাহ মাফ, নৈতিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অর্জনের পথ উন্মুক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে··· যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

এই ইবাদত শুধু শারীরিক অনুশীলন নয় বরং মানবজীবনের যাবতীয় দিককে প্রভাবিত করে। সহীহ হাদীসে এসেছে–

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

রোজা মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে এবং জান্নাতের বিশেষ দরজা আর-রাইয়ান দিয়ে প্রবেশের সৌভাগ্য এনে দিতে পারে।

সমসাময়িক বাস্তবতায় দেখা যায়, অনেক মুসলমান রোজার ফজিলত জানলেও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে ভুল করে বসেন। যেমন–সাহরি, ইফতার, কাজা-কাফফারা, নফল রোজা ইত্যাদি বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায়। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

"অনেকে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ভুল করেন··· না জেনে গুনাহগার হয়ে পড়েন।"

এ কারণে রোজা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও সামাজিক শুদ্ধতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার মাধ্যমে রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, এবং শরীয়তের আলোকে সঠিক বিধান পাঠকের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১.৩ বিষয় নির্ধারণের কারণ

গবেষণাপত্রের বিষয় নির্ধারণের পেছনে কয়েকটি মৌলিক কারণ রয়েছে–

ক. রোজার বিশাল গুরুত্ব ও ফজিলত

কোরআন ও সহীহ হাদীস রোজাকে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করেছে। রোজা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বিশেষ আমলসমূহের একটি–

"রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (সহীহ হাদীস)
এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার প্রয়োজন ছিল।

খ. ভুল ধারণা ও অজ্ঞতার প্রসার

ডকুমেন্টে উল্লেখ করা হয়–

"অনেকে রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানেন না··· ফলে ভুল করে গুনাহগার হয়ে যান।"
এই অজ্ঞতা দূর করার উদ্দেশ্যেই বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

গ. রমজান মাসের আমলসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা

ডকুমেন্টে রমজানের দান-সদকা, তারাবিহ, লাইলাতুল কদর, ইতিকাফ ইত্যাদির গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো সঠিকভাবে পালন করতে জ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন।

ঘ. সমসাময়িক পাঠকের চাহিদা

শরীয়তের বিধান সহজ ভাষায় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই গবেষক বিষয়টি নির্বাচন করেছেন, যাতে পাঠক বাস্তব জীবনে সঠিকভাবে রোজা পালন করতে পারেন।

১.৪ গবেষণার উৎস

এই গবেষণাপত্র মূলত নিম্নোক্ত উৎসসমূহ অনুসরণ করে রচিত হয়েছে–

১. পবিত্র কোরআন

যেখানে রোজার ফরজিয়ত, তাকওয়া অর্জন, লাইলাতুল কদরের فضائل উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–সূরা আল-বাকারা ১৮৩, ১৮৫; সূরা আল-কদর ১-৫।

২. সহীহ হাদীস

ডকুমেন্টে বিভিন্ন সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন–

রোজার গুনাহ মাফের হাদীস
তারাবিহর ফজিলতের হাদীস
রাইয়্যান দরজার হাদীস

৩. ফিকহ ও ফাতওয়াগ্রন্থ

আহসানুল ফাতাওয়া
ফাতাওয়া শামী
মারাকিল ফালাহ (ইতিকাফ প্রসঙ্গে)

৪. ইসলামিক গবেষকদের ব্যাখ্যা

যেমন– শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর ইতিকাফ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

৫. গবেষকের নিজস্ব বিশ্লেষণ ও সংকলন

ঘোষণাপত্রে গবেষক স্বীকার করেছেন–

"এই গবেষণা আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা··· অন্য কোথাও উপস্থাপিত হয়নি।"

সারাংশ

এই গবেষণা অধ্যায়টি রমজানের রোজা বিষয়ক একটি বিশদ অধ্যয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। রোজাকে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হিসেবে চিহ্নিত করে কোরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এর মৌলিক উদ্দেশ্য–যেমন তাকওয়া অর্জন, আত্মশুদ্ধি ও গুনাহ মাফ—স্পষ্ট করা হয়েছে। গবেষণার কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, রোজার ফজিলত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলেও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল (যেমন সাহরি-ইফতারের সময়, কাজা-কাফফারার নিয়ম ইত্যাদি) সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা বিদ্যমান। এই অজ্ঞতা মানুষকে না জেনে গুনাহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এ সমস্যার সমাধানকল্পে এই গবেষণা কাজটি হাতে নেওয়ার পেছনে যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো:

১. কোরআন-হাদীসে রোজার অত্যাধিক গুরুত্ব।
২. মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ভুল ধারণা দূর করা।
৩. রমজানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমল (তারাবিহ, লাইলাতুল কদর, ইতিকাফ) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
৪. পাঠকের বাস্তব জীবনে সঠিক আমল চর্চার চাহিদা পূরণ।

গবেষণাটি **প্রামাণিক উৎস** যেমন পবিত্র কোরআন, সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহ, প্রসিদ্ধ ফিকহগ্রন্থ এবং বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য রোজা সংক্রান্ত একটি সঠিক, সুসংহত ও বাস্তবসম্মত জ্ঞানভাণ্ডার উপস্থাপন করা।

অধ্যায় ২. রোজা সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

২.১ ভূমিকা

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে রোজা বা সিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের একটি গভীরতম প্রকাশ এবং আত্মশুদ্ধি, সংযম ও তাকওয়া অর্জনের এক অনন্য প্রশিক্ষণ। রমজান মাসের ফরজ রোজা পালন মুসলিম জীবনের একটি অপরিহার্য বিধান। তবে রোজা কেবলমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক উপবাসই নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, যা মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে।

রোজার বিধান শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যই নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতের জন্যও ছিল, যদিও এর সময়, পদ্ধতি ও ধরন ভিন্ন ছিল। কুরআন ও হাদিসে রোজার যে মৌলিক ধারণা, সংজ্ঞা, ইতিহাস ও বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে, তা মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশক।

প্রস্তুতকৃত এই অধ্যায়ে রোজা সম্পর্কিত এসব মৌলিক বিষয়সমূহ সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। এখানে রোজার পরিচয়, সংজ্ঞা, ফরজ হওয়ার ইতিহাস ও হিকমত, বিভিন্ন প্রকার রোজার হুকুম-আহকাম এবং রোজা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, পাঠক যেন রোজার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে শরিয়তের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকভাবে এই মহান ইবাদতটি আদায় করতে পারে।

২.২ রোজার পরিচয়

বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা রাখলেও কেবল রমজান মাসের রোজা পালন করা ফরজ। রোজা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদ জন্য ফরজ নয়, বরং তা অতীত নবী-রাসুলদের উম্মতদের জন্যও ছিল। কিন্তু রোজার সময়, পদ্ধতি ও ধারা ভিন্ন ছিল। রোজা বা সাওম ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভের মাধ্যমে মুসলিমরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, পাপাচর এবং যাবতীয় ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকে।

২.৩ রোজার সংজ্ঞাঃ

ক। রোজা বা সাওমের অভিধানিক অর্থ:

সাওম الصَّوْمُ শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহু বচন হলো الصّيام (সিয়াম)। রোজার আরবি শব্দ সাওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম, পরিশুদ্ধি। সাওম পালনকারীকে বলা হয় সায়েম।

খ। ইসলামিক শরিয়তের পরিভাষায়ঃ

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু কাজ, যেমন - পানাহার, স্ত্রী সহবাস, এবং পাপাচার থেকে নিয়তের মাধ্যমে বিরত থাকাকে রোজা বা সাওম বলে।

সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমজানের রোজা রাখা ফরয।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা: ১৮৩)
আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত-

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা বলেন, আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা‘বানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে। (বুখারী-১৯০৯, মুসলিম-১০৮১)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমজান মাসের রোজা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোজা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।
আবুল হোসাইন কুদুরি ও জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন-

الصوم إمساك مخصوص في زمان مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম **صوم** তথা রোজা।
মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন,

الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية

অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার থেকে বিরত থাকা।
শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন,

الصوم هو ترك الأكل والشرب والوطي من الصبح إلى غروب الشمس

অর্থাৎ, সাওম তথা রোজা হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমজান মাসের একটি রোজাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

২.৪ রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস

কুরআনু কারিমে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা এর ১৮৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন,

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

"হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার"।

এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে এর আগেও বিভিন্ন উম্মতের ওপর রোজা ফরজ ছিল, তবে তার নিয়ম ও পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। যেমন- হযরত আদম যখন নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর তাওবা করেছিলেন তখন ৩০ দিন পর্যন্ত তার তাওবাহ কবুল হয়নি। ৩০ দিন পর তার তাওবাহ কবুল হয়। তারপর তার সন্তানদের উপরে ৩০টি রোযা ফরয করে দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

নূহ (আ.)-এর যুগেও রোজা ছিল। কারণ, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: হযরত নূহ (আ.) ১ লা শাওয়াল ও ১০ জিলহজ ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন (ইবনে মাজাহ ১৭১৪) । হযরত ইবরাহীম আ. এর যুগেও ৩০টি রোজা ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। হযরত দাউদ (আ.) এর যুগেও রোযার প্রচলন ছিল। হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন। যাকে সওমে দাউদি বলা হয় (নাসাঈ ১ম খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠা, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃষ্ঠা) ।

আরববাসীরাও ইসলামের পূর্বে রোযা সম্পর্কে কমবেশী ওয়াকিফহাল ছিল। মক্কার কুরাইশগণ অন্ধকার যুগে আশুরার (অর্থাৎ ১০ মুহররম) দিনে এ জন্য রোযা রাখতো যে, এই দিনে খানা কাবার ওপর নতুন গেলাফ চড়ানো হতো। সহিহুল বুখারি ১৫৯২ নং হাদিসে হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْه

তিনি বলেন, রমাযানের সওম ফর্য হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ ‘আশূরার সওম পালন করতেন। সে দিনই কা‘বা ঘর (গিলাফে) আবৃত করা হত। অতঃপর আল্লাহ যখন রমাযানের সওম ফর্য করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘আশূরার সওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরাও পৃথকভাবে আশুরা উৎসব পালন করতো। অর্থাৎ ইহুদীরা নিজেদের গণনানুসারে সপ্তম মাসের ১০ম দিনে রোযা রাখতো।

২.৫ রমজানের রোজার সূচনা

দ্বিতীয় হিজরি সনে মদিনায় মুসলমানের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের

জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমযানের রোজা ফরয হয়। এর পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম আশুরা-র রোজা এক আইয়্যামে বীযের রোজা রাখতেন। হানাফীদের মতে আশূরা-র রোজা তাম ফরয ছিল। তবে শাফিঈ মাযহাবের লোকদের মতে রমযানের রোজার পূর্বে অন্য কোনো রোজা ফরয ছিল না। হানাফীদের মতের পক্ষে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছকে বিশেষভাবে দলীল হিসাবে পেশ করা যায়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ إِنَّ أَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا رَأَى يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالُوا لَا ، قَالَ فَاتمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوه

অর্থাৎ, আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আজ (এই আশূরার দিন) রোজা রেখেছ কি? তারা বলন, না। তিনি বললেন, তাহলে অবশিষ্ট দিনটুকু রোজার মত পূর্ণ করে নাও আর এ দিনের রোজার কাযা করে নিও। (আবূ দাউদ)

এখানে 'কাযা' শব্দটি স্পষ্টতই এ দিনের রোজা ফরয ছিল বলে বোঝায়। তবে পরবর্তীতে এই ফরয মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। এরপর থেকেই মুসলমানদের ওপর পুরো রমজান মাস রোজ রাখা ফরজ হয়ে যায়। সেই থেকে মুসলমানগণ মাসব্যাপী রোজা পালন করে আসছেন। যদিও রোজা ফরজ হওয়ার পরপর ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোজা পালনের বিষয়গুলো কিছুটা শিথিলযোগ্য ছিল। সেই সময় যার ইচ্ছা রোজা পালন করতো, আবার যে কেউ ইচ্ছা করলে রোজার পরিবর্তে একজন গরিব-মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে পারতো। কিন্তু পরবর্তীতে কালক্রমে মানুষ যখন রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন অসুস্থ ও মাজুর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যসকল বোধসম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর রোজা পালন করা আবশ্যক হয়ে যায়।

২.৬ রোজার হুকুম

- ❖ প্রত্যেক আকেল (বোধ সম্পন্ন), বালেগ (বয়সপ্রাপ্ত) ও সুস্থা নর-নারীর উপর রমযানের রোজা রাখা ফরয।
- ❖ ছেলে মেয়ে দশ বৎসরের হয়ে গেলে তাদের দ্বারা (জোর তাকীদ দিয়ে হলেও) রোজা রাখানো কর্তব্য। এর পূর্বেও শক্তি হলে রোজা রাখার অভ্যাস করানো উচিত।
- ❖ বৎসরে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম। ঐ পাঁচ দিন হল দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন।
- ❖ এক দেশে রোজা শুরু করার পর অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায়, তাহলে নিজের দেশের হিসাবে যে কয়টা রোজা বাদ গিয়েছে তার কাযা করতে হবে। আর যদি সেখানে গিয়ে রোজা এক দুটো বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে।

২.৭ রোজার ধরন

রোজা মোট পাঁচ প্রকার। যথাঃ-

১. ফরজ; ২.ওয়াজিব; ৩. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা রোজা; ৪. মাকরুহ রোজা; ৫. হারাম রোজা।

২.৭.১ ফরজ রোজা

যেমন রমজানের রোজা ফরজ। রমাজানের রোজা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর ইজমা' (সর্বসম্মতি) মতে চিরকালের জন্য ফরয।
আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৩) ।

অত্র আয়াতের মাধ্যমেই রোজা ফরজ হয়েছে। আবার রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, রমজানের রোজাকে অস্বীকার করলে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

"রমাযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোজা রাখে।' (সুরা বাকারা: ১৮৫) ।

হাদীসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "ইসলামের ভিত্তি হল ৫টি কর্ম; আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারে উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর রসূল (দূত) -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাৎ প্রদান করা, রমাযানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ করা" (বুখারী ৮, মুসলিম ১৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ) । তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর আল্লাহ কি কি রোজা ফরয করেছেন তা আমাকে বলে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, "রমাযান মাসের রোজা।" লোকটি বলল, 'এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার কর্তব্য আছে?' তিনি বললেন, "না, তবে যদি তুমি নফল রোজা রাখ, তাহলে ভিন্ন কথা" (সহিহ বুখারী, ১৮৯১)। আর মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, রমাযানের রোজা ফরয। তা ইসলামের অন্যতম রুকন, খুঁটি বা ভিত্তি। এ ফরয হওয়ার কথা সহজ উপায়ে সকলের জানা। সুতরাং যে কেউ তা অস্বীকার করবে সে মুরতাদ্দ্ কাফের। তাকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাতে সে তওবা করলে এবং রোজা ফরয বলে মেনে নিলে উত্তম। নচেৎ, (সরকার) তাকে কাফের অবস্থায় হত্যা করবে (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৩, ফুসূল ৪-৫পৃঃ)।

২.৭.২ ওয়াজিব রোজা

- মানতের রোজা: মানতের রোজা হলো কোনো বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে করা একটি প্রতিজ্ঞা বা মানত। যখন কেউ এমন প্রতিজ্ঞা করে যে তার কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে সে নির্দিষ্ট সংখ্যক রোজা রাখবে, তখন সেই রোজাগুলোই হলো মানতের রোজা। মানতের রোজা পূরণ করা ওয়াজিব।

- ❖ নির্দিষ্ট মানতের রোজা: নির্দিষ্ট মানতের রোজা হলো এমন একটি রোজা যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে মানত করা হয়েছে। এই মানত পূরণ করা আবশ্যক (ওয়াজিব) ।
- ❖ **সাধারণ মানতের রোজা:** সাধারণ মানতের রোজা হলো এমন রোজা যা একজন ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের জন্য আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা বা মানত করে রাখেন। এটি একটি আবশ্যিক ইবাদত, যা পূরণ করা বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)।
- ❖ **কাফফারার রোজা:** রোজার কাফফারা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভাঙার জন্য জরিমানা বা প্রায়শ্চিত্ত। এটি আদায়ের জন্য তিনটি বিকল্প আছে: (১) একটি দাসকে মুক্ত করা, (২) একটানা ৬০টি রোজা রাখা, অথবা (৩) ৬০ জন গরীব মিসকিনকে দু'বেলা পেটভরে খাওয়ানো।

তবে, যদি কোনো ওজর বা কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভাঙা হয়, তাহলে কাজা রোজা রাখার পাশাপাশি এই কাফফারাও আদায় করতে হয়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমযানে। তিনি বললেনঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি ক্রমাগত দু’মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। এমতাবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক ‘আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এগুলো তোমার তরফ হতে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্থ কে? অথচ মাদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্থ কেউ নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলে তুমি স্বীয় পরিবারকেই খাওয়াও। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৯৩৭)

২.৭.৩ সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা রোজা

ক। শবে বরাত:

শবে বরাত উপলক্ষে রোজা রাখা একটি উত্তম আমল, যা শবে বরাত-এর পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই শাবানের দিবাগত রাত অর্থাৎ ১৫ই শাবান তারিখে রাখা হয়। এই রোজা রাখা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। “শবে বরাত” মূলত ফারসি শব্দ। তবে হাদিসের ভাষায় বলা হয় ‘লাইলাতু নিসফি মিন শাবান’ বা মধ্য শাবানের রজনী। তাফসিরের ভাষায় এটাকে ‘লাইলাতুস সাক’, ‘লাইলাতুর রহমাহ’ ও ‘লাইলাতুল বারাআত’ বলা হয়। শবে মানে হচ্ছে রাত আর বরাত মানে হচ্ছে মুক্তি। অর্থাৎ শবে বরাত অর্থ হচ্ছে মুক্তির রাত। কারন এ রাতে আল্লাহ্ তার অগনিত বান্দাকে ক্ষমা করে থাকেন।

হাদিসে এসেছে, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না) । আমি (তাঁর সন্ধানে) বের হলাম। এসে দেখলাম তিনি বাকী কবরস্তানে আছেন। তিনি বলেনঃ তুমি কি ভয় করছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি কোন অবিচার করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনুমান করলাম আপনি আপনার অন্য কোন বিবির নিকটে গিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মধ্য শা'বানে (১৫ তারিখের রাতে) দুনিয়ার কাছের আকাশে অবতীর্ণ হন। তারপর

কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে তিনি মাফ করে দেন। (জামে আত'তিরমীজি, হাদিস নং ৭৩৯)

হযরত আলা ইবনুল হারিছ রাহ. থেকে বর্ণিতঃ হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়তো মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন-

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

‘এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই’ (-শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩৮২-৩৮৩) ।

খ। শবে বরাতের রোজা ও শবে বরাত উপলক্ষে অন্যান্য করণীয়:

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে বলা হয় শবে বরাত বা লাইলাতুল বরাত। "শবে বরাত" কথাটা ফারসি, আর লাইলাতুল বরাত কথাটা আরবী। "শব" বা "লাইলাতুন" শব্দের অর্থ রাত, আর "বরাত" অর্থ মুক্তি। অতএব "শবে বরাত" বা "লাইলাতুল বরাত"-এর অর্থ হল মুক্তির রাত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই রাতে বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, যারা পাপ থেকে মুক্তি চাওয়ার আছ মুক্তি চাও, আমি মুক্তি দিয়ে দিব। যারা অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চাওয়ার আছ মুক্তি চাও, আমি মুক্তি দিয়ে দিব। যারা রোগ-শোকগ্রস্ত আছ, মুক্তি চাও আমি মুক্তি দিয়ে দিব। এভাবে আল্লাহ পাক পাপ, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস থেকে এই রাতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তাই এই রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, শবে বরাত অর্থ ভাগ্যের রাত বা ভাগ্যরজনী। এই অর্থ ঠিক নয়। শবে বরাত কথাটার সঠিক অর্থ ভাগ্যরজনী নয় বরং মুক্তির রাত। এটা হল গোনাহ্-খাতা, অভাব অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়ার রাত এবং মুক্তি পাওয়ার রাত। শবে বরাত একটি মর্যাদাপূর্ণ রাত। হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী, হাম্বলী চার মাযহাবের ইমামগণের নিকটই এ রাত ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বলে স্বীকৃত। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াত দ্বারা এ রাতের মর্যাদা ও ফযীলত প্রমাণিত। নিম্নে এরূপ কয়েকটি রিওয়ায়াত ও তার আলোকে এ রাত ও তার পরবর্তী দিনে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

শবে বরাত উপলক্ষ্যে কি কি করণীয় সে সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে-

عن معاذِ بنِ جبلٍ , عنِ النَّبيِّ صلّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ , قالَ : يطَّلِعُ اللهُ إلى خَلقِه في ليلةِ النِّصفِ مِن شعبانَ فيغفِرُ لجميعِ خَلْقِه إلّا لِمُشركٍ أو مُشاحِنٍ

অর্থ: হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শা'বানের রাতে [শবে বরাতে] তাঁর সৃষ্টির প্রতি মনযোগী হন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৫৬৬৫; সুনানে ইবনে মাজাহ্, হা: ১৩৯০; মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবাহ, হা: ৩০৪৭৯; ওয়াবুল ঈমান, হা: ৬২০৪)।

অন্য হাদিসে এসেছে-

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانت ليلةُ النِّصفِ من شعبانَ فقوموا ليلَها، وصوموا نَهارَها، فإنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فيها لغُروبِ الشَّمسِ إلى سماءِ الدُّنيا، فيقولُ: ألا من مُستغفِرٍ لي فأغفرَ لَه ! ألا مُسترزِقٌ فأرزقَهُ ألا مُبتلًى فأعافيَهُ ألا كذا ألا كذا حتّى يطلُعَ الفجر

অর্থ: হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অর্ধ শা'বানের রাত [১৪ শা'বান দিবাগত রাত] যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজারাখা রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ রাতে সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে আসেন এবং বলতে থাকেন, আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করবো। আছে কি কোনো রিযিক প্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দিব। আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিবো। আছে কি এমন আছে কি এমন, এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বলতে থাকেন (-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২৩৮৪; শুয়াবুল ঈমান, হা: ৩৮২২; আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব: ২/১৩৩) ।

আরেকটা হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَض قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ : أَكُنتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لَا كُثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْب

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, এক রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না পেয়ে আমি খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে (অর্থাৎ, মদীনার কবরস্থানে) গিয়ে আমি তাঁকে পেলাম। তিনি বললেন কী ব্যাপার আয়েশা! (তুমি যে তালাশে বের হয়ে এলে?) তোমার কি মনে হয় আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার উপর কোনো অবিচার করবেন? তিনি বললেন (কেন মনে করব না?) আমার তো ধারণাই হয়েছে অন্য কোনো বিবির কাছে গিয়ে থাকবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, যখন শা'বান মাসের ১৫ই রাত আসে অর্থাৎ, যখন শবে বরাত আসে, আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর বনু কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন (তিরমিযী, শরহুছ-ছুন্নাহ ও শুআবুল ঈমান) ।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল শবে বরাতের একটি আমল হল আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফ চাওয়া। এ রাতে যার যা চাওয়ার আছে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। বিশেষ ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

উপরের হাদীস দ্বারা জানা গেল এ রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়েছিলেন জিয়ারতের জন্য। অতএব এই রাতে জিয়ারতের জন্য কবরস্থানে যাওয়া যায়। তবে এ আমলটিকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা যাবে না। কেননা, এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন একাকী, কাউকে ডেকে জামাআত সহকারে, আড়ম্বর করে যাননি। এটি অত্যাবশ্যকীয় বা সকলের করণীয় বিষয় হলে অবশ্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে ডেকে জামাআত সহকারে তা করতেন। অতএব কেউ চাইলে আড়ম্বর ছাড়া কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারতও করে আসতে পারেন। প্রত্যেকটা আমল সেভাবেই করতে হবে যেভাবে কুরআন হাদীসে এসেছে।

আরও উল্লেখ্য যে, কবর জিয়ারত মুরদাদের জন্য এক ধরনের ঈছালে সওয়াব। "ঈছালে সওয়াব" -এর অর্থ হল সওয়াব পৌঁছে দেওয়া। যারা দুনিয়া থেকে চলে যান তাদের কাছে আমরা বিভিন্ন ভাবে সওয়াব পৌঁছাতে পারি-দুআ করলেও সওয়াব পৌঁছে, যে কোনো ইবাদত করে- নফল নামায পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে, যিকর-আযকার করে, দান-সদকা করে, যে কোনোভাবে নফল ইবাদত করে এর সওয়াব তাদের কাছে পৌছাতে পারি। এটাকেও বলে ঈছালে সওয়াব।

এই রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন নর-নারী এবং শহীদদের জন্য দুআ করেছিলেন, এটা ঈছালে সওয়াবের পর্যায়ভুক্ত। তাই এ রাতে মুরদাদের জন্য অন্য যে কোনোভাবে ঈছালে সওয়াব করা যায়। দান-সদকা করেও করা যায়। গরীবদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও করা যায়। তবে এই আহারের ব্যবস্থা হালুয়া রুটির মাধ্যমেই হতে হবে তা জরুরী নয়। বরং এই রাতে হালুয়া রুটি করা একটা রছমে পরিণত হয়েছে। তাই এ রছম থেকে বিরত থাকা জরুরী।
শবে বরাতের আমল প্রসঙ্গে আর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا -

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন শাবান মাসের মধ্যের রাত হয় (অর্থাৎ, যখন ১৪ই তারিখ দিবাগত রাত হয়), তখন তোমরা সেই রাত জাগরণ কর আর পরের দিন রোজা রাখ এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ إِلَّا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَاغْفِرَ لَهُ، أَلَّا مُسْتَرْزِقُ فَارْزُقَهُ، أَلَّا مُبْتَلَى فَأُعَافِيَهُ، إِلَّا كَذَا إِلَّا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ - رواه ابن ماجة في اقامة الصلوة – باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان . والبيهقى فى شعب الايمان حديث رقم ٣٨٢٢ . ورجال الحديث لم يذكرهم احد بالجرح الشديد الا ان ابن ابي سبرة جرحه على بن المديني والنسائي وابن عدى وغيرهم ولكن جرحهم مبهم غير مبرهن فلا يقبل . وعده الامام مالك من مشائخ المدينة وكان قاضيا مقتيا في المدينة ، فكيف يكون كذابا كما زعم . ونبه الذهبي في "السير" ان ضعفه من ناحية الحفظ. وهذا مما يغتفر، لا سيما في مثل هذا الباب).

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে চলে আসেন। প্রথম আসমানে এসে মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, তোমাদের কেউ গোনাহগার আছে, আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব। তোমাদের কেউ রিযিক চাওয়ার আছে আমার কাছে রিযিক চাইবে, আমি তাকে রিযিক দান করাবো। তোমাদের কেউ অসুস্থ্য আছে, রোগ-শোকগ্রস্ত আছে, আমার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাইবে, আমি তাকে মুক্তি দিয়ে দিব। একার সুবহে সাদেক পর্যন্ত (ইবনে মাজা ও শুআবুল ঈমান)।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এক একটা বিষয়ের উল্লেখ করে করে বলতে থাকেন, অমুকটা চাওয়ার আছ চাও আমি দিয়ে দিব। অমুকটা চাওয়ার আন্ত চাও আমি দিয়ে দেব। এভাবে এক একটা বিষয়ে উল্লেখ করে

আল্লাহ পাক ডেকে ডেকে চাওয়ার জন্য বলতে থাকেন। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে মানুষকে ডেকে ডেকে চাইতে বলেন, দুআ করতে বলেন।

শবে বরাত উপলক্ষে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে:-

- **একটি আমল হলঃ** রাত্র জাগরণ করা। রাত্র জাগরণ একটা পরিভাষা। রাত্র জাগরণ বলতে বোঝানো হয় নফল ইবাদত করা। অর্থাৎ, এশার পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নফল নামায পড়া। এই রাতে বেশী বেশী নফল নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে।
- **আর একটি আমল হলঃ** পরের দিন রোজা রাখা। পরের দিন অর্থাৎ, ১৫ই শা'বান একটি রোজা রাখা নফল। নফলের নিয়তে এই রোজা রাখলে চলবে।
- **আর একটি আমল হলঃ** রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়া।

অতএব এসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, শবে বরাত উপলক্ষে যা কিছু আমাদের করণীয় তার মধ্যে রয়েছেঃ

১. এই রাতে নফল ইবাদত করা।
২. পরের দিন রোজা রাখা।
৩. এই রাতে সবকিছুর জন্য দুআ করা। বিশেষভাবে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়া।
৪. আড়ম্বর ব্যতীত চাইলে পুরুষরা কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করতে পারে।
৫. চাইলে যে কোনোভাবে মুরদাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা।

এই পাঁচটি (মহিলাদের জন্য চারটি) আমলের কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর বাইরে মানুষ যা কিছু করে, তা মানুষের মনগড়া তৈরী। পটকা ফোটানো, আতশবাজী করা, মোমবাতি জ্বালানো, হালুয়া রুটি খাওয়া ইত্যাদি মানুষের মনগড়া রছম। এসব থেকে বিরত থাকা চাই। একথা মনে করা যাবে না যে, ছোট বাচ্চারা মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, ছোট বাচ্চারা পটকা ফোটাচ্ছে তাতে আর এমন কী ক্ষতি? কিন্তু আমরা টাকা-পয়সা দিচ্ছি, সমর্থন করছি, আমাদের সহযোগিতায় হচ্ছে, কাজেই আমরাও ঐ গোনাহে শরীক হয়ে যাচ্ছি। আমরা যদি সমর্থন দেই, কিংবা তাতে বাধা না দেই, তাহলে ওরা শিখবে যে, এগুলো করতে হয়। এভাবে একটা অন্যায় জিনিস ছোটদেরকে শিক্ষা দেওয়া হল। এভাবে আমাদের ছোট সন্তান, আমাদের ছোট ভাই-বোন, আমাদের আপন জনকে আমরা অন্যায় কাজ শিক্ষা দিলাম। অন্যায় কাজ শিক্ষা দেওয়াও অন্যায়।

সবশেষে আবারও একটা বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কেউ কেউ বলে থাকেন শবে বরাতের কোনো ফযীলত সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। একাধিক হাদীসে শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এসব হাদীসের মধ্যে কোন কোন হাদীসকে কেউই যয়ীফ বলেননি। যেমন পূর্বে আমরা হাদীসের তাহকীক পেশ করেছি। দু'একটি হাদীসকে কেউ কেউ যয়ীফ বলেছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে এসব হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। সব মাযহাবের ইমামগণের নিকটই এ রাত তাৎপর্যপূর্ণ ও ফযীলত পূর্ণ রাত।

গ। আশুরার রোজা:

আশুরার রোজা হলো মহররম মাসের ১০ তারিখে রাখা একটি রোজা, যা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ। এই রোজার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ হয় বলে হাদিসে বর্ণিত

আছে। আশুরার রোজা সাধারণত দুটি রাখা হয়: মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ, অথবা ১০ ও ১১ তারিখ। এর ফলে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য এড়ানো যায়, কারণ তারা শুধু ১০ তারিখ রোজা রাখত।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে ‘আশূরার দিনে সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের সওম ফারয করা হলো তখন যার ইচ্ছা (‘আশুরার) সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না। (সহিহ বুখারীর, ২০০১)

ইব্নু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে ‘আশূরার দিনের সওমের উপরে অন্য কোন দিনের সওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)। (সহিহ বুখারী, ২০০৬)

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ‘আশূরার দিনকে ইয়াহুদীগণ ‘ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীগণকে) বললেনঃ তোমরাও এ দিনের সওম পালন কর। (সহিহ বুখারী, ২০০৫)

‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশগণ ‘আশূরার সওম পালন করত এবং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - ও এ সওম পালন করতেন। যখন তিনি মাদীনায় আগমন করেন তখনও এ সওম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমযানের সওম ফরয করা হল তখন ‘আশূরার সওম ছেড়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না। (সহিহ বুখারী, ২০০২)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের সলাত। (সহিহ মুসলিম, ২৬৪৫)

ইব্নু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ ‘আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আ) সওম পালন করেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং সওম পালনের নির্দেশ দেন।

উবায়দুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: «مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ» يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ)-কে যখন আশুরার সাওম (রোজা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি তাকে বলতে শুনেছেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযান মাসের ও আশুরার সাওম (রোযা) ব্যতীত অন্য কোন দিনের সাওম (রোজা)-কে অন্য দিনের সাওমের (রোজার) উপর গুরত্ব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নম্বর ২৩৭০)

পরবর্তী মুহাররম পর্যন্ত রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকেননি। তবুও তিনি রোজা রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন বিধায় উত্তম হল ১০ তারিখের সঙ্গে আরেকটি রোযা রাখা, নয় তারিখ বা ১১ তারিখ। এভাবে ১০ তারিখের সঙ্গে আগে বা পরে আরও একটি মিলিয়ে মোট দুইটি রোযা রাখা উত্তম। ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, যদি কেউ শুধু ১০ তারিখে রোজা রাখে অর্থাৎ, একটা রোজা রাখে, সেটা ভাল নয় মাকরূহ তানযীহী। দুটো রোজা রাখাই উত্তম।

মোটকথা- আশুরার রোজা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার মনোভাব সৃষ্টি করাই হচ্ছে আশুরার দিনের কাজ। হ্যাঁ পরবর্তীতে এই দিনে হযরত হুসাইন (রাঃ) কারবালার ময়দানে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন। উম্মতের জন্য এই ঘটনার স্মৃতি বেদনাদায়ক, হৃদয় বিদারক- একথা সত্য, কিন্তু এই বেদনার স্মৃতি স্মরণ করার মাধ্যমে আশুরা দিবস পালন করতে হবে একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়ে যাননি। এ দিনে যদি আমাদের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য দিনে তা স্মরণ হলে যা করণীয়, এদিনেও ততটুকুই করণীয়। যেকোনো বিপদ-আপদ আসলে বা বিপদ-আপদের কথা স্মরণ হলে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পাঠ করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। এ হিসাবে কারবালার স্মৃতি যেহেতু একটা বড় দুঃখজনক স্মৃতি, বেদনাদায়ক স্মৃতি, তাই এটা স্মরণ হলে আমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করতে পারি। তবে তা পাঠ করা জরুরী নয়। কারণ পুরাতন মৃত্যুর স্মৃতি স্মরণ হলে প্রত্যেকবার এটা পাঠ করতে হবে তা জরুরী নয়। কেউ পাঠ করতে চাইলে পাঠ করতে পারে।

এই হল আশুরার দিনে করণীয় বিষয় এর বাইরে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করে, কারবালার কথা স্মরণ করে যা কিছু করা হচ্ছে, যেমন- মাতম করা হচ্ছে, বুক চাপড়ানো হচ্ছে, হায় হুসাইন হায় হুসাইন, ইয়া আলী! বলে আবেগ জাহির করা হচ্ছে, শোক মিছিল করা হচ্ছে, তা'যিয়া বের করা হচ্ছে, এগুলো মানুষের সৃষ্টি করা রছম ও কুসংস্কার। কুরআন-হাদীছে এর কোনো ভিত্তি নেই। কোনো সাহাবী থেকে এ সমস্ত আমল পাওয়া যায় না। বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো করেননি।

ঘ। ايام بيض (আইয়্যামে বীজ) এর রোজা:

প্রতি মাসে আইয়ামে বীজের রোজা রাখা অনেক ফযীলতপূর্ণ আমল। আর এর তারিখ হচ্ছে, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। আইয়াম হলো আরবি ইয়াওম শব্দের বহুবচন। যার অর্থ হলো দিনগুলো। আর বীজ শব্দের অর্থ সাদা, শুভ্র। আইয়ামে বীজ দ্বারা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ বোঝানো হয়। এই দিনগুলোতে চাঁদ পূর্ণাঙ্গ থাকে এবং রাত উজ্জ্বল হয়, তাই এই দিনগুলোকে 'আইয়্যামুল বিজ' বা 'উজ্জ্বল দিনের রোজা' বলা হয়। রাসুল সা. আইয়ামে বীজে (আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে)

রোজা রেখেছেন এবং সাহাবিদের রোজাগুলো রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত এই রোজা রাখতেন, তাই এটি একটি সুন্নাত-এ-গায়রে মুয়াক্কাদা (বিশেষভাবে অনুসৃত সুন্নাত) হিসেবে বিবেচিত। আইয়ামে বিজের রোজা রাখার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ বছরজুড়ে সহজে রোজার সওয়াব পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম এ রোজা। আইয়ামে বিজে রোজা রাখার বিষয়ে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং বলেছেন, 'আইয়ামে বিজের রোজা রাখা সারা বছরই রোজা রাখার সমতুল্য।'

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺصلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَام

তিনি বলেন, আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন করা এবং দু'রাক'আত সলাতুয-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৯৮১; জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৭৬০)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেনঃ হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা পালন করতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন কর।" (জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৭৬১)। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন রোজা পালন করে তা যেন সারা বছরই রোজা পালনের সমান। আল্লাহ্ তা'আলা এর সমর্থনে তার কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেনঃ "কোন লোক যদি একটি সাওয়াবের কাজ করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে এর দশ গুণ" (সূরাঃ আন'আম- ১৬০)। সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান। (জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৭৬২)। ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ধৈর্যের (রমাযান) মাসে রোজা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোজা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্কা দূর করে দেয়।" (বাযযার, সহীহ তারগীব, আলবানী ১০১৮নং)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بعشر أمثالِهَا وَذَالك مثل صِيَامِ الدهر . متفق عليه . رواه البخارى فى كتاب الصوم - باب صوم الدهر ، ورواه مسلم في كتاب الصيام - باب استحباب صوم ثلثلة ايام من كل شهر الخ . واللفظ للبخاري .)

অর্থাৎ, নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, 'তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখবে-এটা তোমার জন্য ভালো। কেননা তোমার একটি সৎকাজ দশগুণ সমান; ফলে তুমি যেন পুরো বছরই রোজা রাখছো।' (বোখারী ও মুসলিম)।

অন্য রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় আইয়্যামে বীয ব্যতীত অন্য যে কোনো তিন দিন নফল রোজা রাখলেও ঐ ফযীলত হাসিল হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আইয়্যামে বীযের রোজা রাখতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ حَفْصَةَ رَض قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُن يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الغداة . (رواه النسائي في كتاب الصيام - صوم ثلثة ايام من الشهر

অর্থাৎ, হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন যে, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি আমল কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোজা রাখা, (ওজর না থাকলে) যিলহজ্জের নয় দিন রোজা রাখা, প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা আর ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত (সুন্নাত) । (নাসায়ী)

ঙ। শাওয়াল মাসের রোজা:

শাওয়ালের ছয়টি রোজা অর্থাৎ শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোজা রাখা হলো এক ধরনের নফল রোযা, যা রমজান পরবর্তী মাস শাওয়ালে রাখা হয়। মাসটি চান্দ্র বছরের মাসের ক্রমানুসারে দশম মাস এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ব্যতীত অন্য দিনসমূহে ছয়টি রোজা রাখা জায়েজ।

আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ রমাযান মাসের সিয়াম পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত। (সহিহ মুসলিম, ২৬৪৮) (ই.ফা. ২৬২৫, ই.সে. ২৬২৪)

আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখলো।” (মুসলিম ১১৬৪)

উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) হারাম মাসসমূহে সিয়াম রাখতেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, তুমি শাওয়াল মাসে সিয়াম পালন করো। অতঃপর তিনি হারাম মাসসমূহের সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেন এবং আমরণ শাওয়াল মাসে সিয়াম পালন করেন (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর ১৭৪৪)।

হজরত উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (স:) আমি কি সারা বছর রোজা রাখতে পারব? তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন—তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে, কাজেই তুমি সারা বছর রোজা না রেখে রমজানের রোজা রাখো এবং রমজানের পরবর্তী মাস শাওয়ালের ছয় রোজা রাখো, তাহলেই তুমি সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে। (তিরমিজি: ১/১৫৩৪)

চ। নবম (৯ই) যিলহজ্জ (আরাফার দিন)-এর রোজা:

আরাফার দিনে রোজা রাখার ফযীলত সম্পর্কে হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ احْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ - (رواه مسلم في كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم يوم عرفة الخ.)

অর্থাৎ, আরাফার দিনের রোজা- আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, ঐ রোজা তার পূর্বের বৎসরের ও পরের বৎসরের গোনাহ মুছে ফেলবে (মুসলিম)।

তবে আরাফার দিনে রোজা রাখা আরাফায় অবস্থানকারী হাজীদের জন্য নয়। বরং যারা হজ্জে রত নয় তাদের জন্য।

এ সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. (رواه أبو داود في كتاب الصيام - صوم عرفة بعرفة ، ورواه الحاكم في المستدرك حديث رقم لا وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন (আবূ দাউদ ও মুস্তাদরকে হাকিম) ।
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদায় হজ্জে আরাফার দিন রোজা রাখেন নি। এক রিওয়ায়াতে এসেছে-

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ . (متفق عليه رواه البخارى فى المناسك - باب صوم يوم عرفة ، ورواه مسلم في كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة . واللفظ للبخاري

অর্থাৎ, হযরত উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ লোকেরা আরাফার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রেখেছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহে পতিত হলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পানীয় প্রেরণ করলাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন। (ফলে মানুষ নিশ্চিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রাখেননি।) [বোখারী ও মুসলিম]

২.৭.৪ মাকরুহ রোজা

যেমন صوم وصال তথা লাগাতার রোজা।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ. فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّك تواصل يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويسقيني

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে বিসাল (অর্থাৎ- একাধারে সওম রাখতে) নিষেধ করেছেন। তখন তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একাধারে সওম রাখেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো? আমি তো এভাবে রাত কাটাই যে, আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পরিতৃপ্ত করেন (সহীহ: বুখারী ৭২৯৯, মুসলিম ১১০৩, মালিক ১০৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৫৯৫, আহমাদ ৭৭৮৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৭৫, ইবনু হিব্বান ৬৪১৩) ।

২.৭.৫ হারাম রোজা

যেমন ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরিকের রোজা। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আইয়ামে তাশরিকের (ঈদুল আযহার পরের তিন দিন: জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) মোট পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ। এই দিনগুলোতে রোজা রাখা যাবে না, কারণ এগুলো ঈদ বা উৎসবের দিন।
বনূ আযহারের আযাদকৃত গোলাম আবূ 'উবাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি একদা ঈদে 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুই দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত্ খাও। আবূ 'আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, ইব্নু 'উয়ায়নাহ (রহঃ) বলেন, যিনি ইব্নু আযহারের মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক বর্ণনা করেছেন; আর যিনি 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আওফ (রাঃ)- এর মাওলা বলেছেন, তিনিও ঠিক বর্ণনা করেছেন। (সহিহ বুখারী, ১৯৯০)।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَة

তিনি বলেন, দু' (দিনের) সওম ও দু' (প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সওম এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) হতে। (সহিহ বুখারী, ১৯৯৩) ।

যিয়াদ ইব্নু জুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে ('আবদুল্লাহ) ইব্নু 'উমার (রাঃ)- কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোন এক দিনের সওম পালন করার মানত করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন পড়ে যায়। ইব্নু 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই (ঈদের) দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (সহিহ বুখারী, ১৯৯৪)

আয়িশাহ্ (রাঃ) ও ইব্নু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সওম পালন করার অনুমতি দেয়া হয়নি। (সহিহ বুখারী, ১৯৯৮)।

উম্মু হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবু মুররাহ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ
একদা তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের সাথে তার পিতা 'আমর ইবনুল 'আসের (রাঃ) এর নিকট যান। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার এনে তা খেতে বললেন। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি সওমরত আছি। 'আমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দিনগুলোতে আমাদেরকে সওম ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। মালিক (রহঃ) বলেন, তা হল তাশরীকের দিনগুলো। (সুনানে আবু দাউদ, ২৪১৮)

আবূ 'উবাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, একদা 'উমার (রাঃ) এর সাথে আমি এক ঈদের সলাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্ববাহ্র পূর্বে সলাত পড়লেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'দিন সওম রাখতে

নিষেধ করেছেন। কেননা কুরবানীর দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত খেয়ে থাকো। আর ঈদুল ফিতরের দিন হল তোমাদের সওমের সমাপ্তি। (সুনানে আবু দাউদ, ২৪১৬)

সারাংশ:

এই অধ্যায়ে রোজা বা সিয়ামের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ:

রোজার পরিচয় ও সংজ্ঞা: রোজার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়তসহ পানাহার, স্ত্রীসহবাস ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং শুধু এই উম্মতের জন্যই নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও এটি ফরজ ছিল।

ফরজ হওয়ার ইতিহাস: রমজানের রোজা ইসলামের দ্বিতীয় হিজরিতে ফরজ হয়। কুরআনের সূরা বাকারার আয়াত ১৮৩ ও ১৮৫ দ্বারা এটি প্রমাণিত। ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা রাখার প্রচলন ছিল। হানাফি মাযহাব মতে, আশুরার রোজা ফরজ ছিল, যা পরে রহিত হয়ে যায়।

রোজার হুকুম: প্রত্যেক বালিগ, সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মুসলমান নর-নারীর উপর রমজানের রোজা ফরজ। এছাড়াও শিশুদের জন্য রোজার অভ্যাস করানো, রোজা রাখা নিষিদ্ধ (ঈদের দিন) উল্লেখ করা হয়েছে।

রোজার প্রকারভেদ: রোজাকে অনুযায়ী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

ফরজ: রমজান মাসের রোজা।

ওয়াজিব: মানতের রোজা ও কাফফারার রোজা।

সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা: বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ নফল রোজা যেমন- শবে বরাত, আশুরা, আইয়ামে বিজ, শাওয়ালের ছয় রোজা এবং আরাফার দিনের রোজা (হাজীগন)।

মাকরুহ: লাগাতার রোজা রাখা (وصال).

হারাম: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আইয়ামে তাশরিকের (১১, ১২, ১৩ জিলহজ্জ) মোট পাঁচ দিন রোজা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মূল বক্তব্য: অধ্যায়টি রোজাকে একটি ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যা আত্মিক শুদ্ধি, আল্লাহভীতি ও সামাজিক সংহতি অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটি কুরআন, হাদিস ও বিশুদ্ধ ফিকহী منابع এর আলোকে রোজার প্রয়োগ করেছে।

অধ্যায় ৩. রোজা ও রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত

৩.১ ভূমিকা

রমজান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অপার রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন। রোজা শুধুমাত্র ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, যা মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। রোজার মাধ্যমে বান্দা তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আত্মশুদ্ধির উচ্চ মাকামে পৌঁছাতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)।

এই অধ্যায়ে রোজা ও রমজানের গুরুত্ব, ফজিলত, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য এবং এর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতাসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি রমজান মাসের বিশেষ ইবাদত যেমন তারাবিহ, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা, ইতিকাফ এবং লাইলাতুল কদরের ফজিলতও এখানে উপস্থাপন করা হবে। রমজানের রোজা শুধু একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতই নয়; বরং এটি মুমিন জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের মাস, যা আমাদেরকে সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে খোদাভীতি অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ দেখায়।

৩.২ রোজার গুরুত্ব

রমযনের রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোজার স্থান। রোজার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোজা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা (২): ১৮৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন- ُفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। (সূরা বাকারা (২): ১৮৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وفي رواية : صوموا لرؤيته ،إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোজা রাখবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৮০ (১৭-১৮) ।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোজা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোজা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয। তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোজাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم .رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোজা ভেঙ্গে ফেলে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস: ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস: ৭৬৬৬) ।

রমযান মাসের একদিন রোজা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখলেও রমযানের এক রোজার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোজাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোজা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস: ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০) ।

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোজা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোজার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৮৭৮)

৩.৩ কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব

কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রমজানের রোজা ছাড়াও অন্যান্য মাসেও রোজা রাখার বিধান রয়েছে, যা সারা বছর ইবাদত করার সমতুল্য বলে গণ্য হয়। রোজা পালনের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে থাকা এবং শয়তানের প্রলোভন থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون

“আর তোমরা যদি রোজা রাখো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।” (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৪)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه

“রমজান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সঠিক পথের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।” (সূরা আল-বাকারা:১৮৫)

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّار

“সিয়াম হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল, যা দ্বারা বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে।” (আহমাদ হা/১৫২৯৯; তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮১) ।
অন্য হাদিসে এসেছে- আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

“যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১)।
অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে- সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবীজি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُم

“জান্নাতের রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬) ।
একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সিয়াম তার মধ্যে সে ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে। এ মাসে বান্দার জন্য আল্লাহর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বান্দার ইবাদতে বাধা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ-

‘যখন রমযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হয়’। (মিশকাত হা/১৯৫৬ ‘সওম’ অধ্যায়।)

তিনি আরও বলেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَة-

‘যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহবানকারী আহবান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ’তে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে’। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, শু‘আবুল ঈমান হা/৩৫৯৮; মিশকাত হা/১৯৬০।)

‘সিয়াম’ মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, **الصِّيَامُ جُنَّةٌ** ‘ছিয়াম ঢাল স্বরূপ’। (*মিশকাত হা/১৯৪৯*) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, **والمراد أنه حجاب وحصن للصائم من المعاصى.** ‘ঢাল দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল- সিয়াম পাপাচার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ছায়েমের জন্য পর্দা ও রক্ষাকবচ’।
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ‘যখন তোমাদের কারো সিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে, তাহ’লে সে যেন বলে, আমি রোজা’। (মিশকাত হা/১৯৫৯।)

মানুষের জন্য সিয়াম পালনের গুরুত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদী সহ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও তা ফরয করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن,

'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩) ।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه 'তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন সিয়াম রাখে' (বাক্বারাহ ২/১৮৫) ।

রমযানের সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতি বছর মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষায় যখন মানুষ উত্তীর্ণ হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার ও যাবতীয় গোনাহ হ'তে বিরত থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ জানেন ও দেখেন মনে করে গোপনেও আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃত সিয়ামপালনকারী সে তীব্র গরমের সময় কলিজা ফেটে যেতে চাইলেও এক ফোটা পানি পান করে না। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর দুর্বল হ'লেও সামান্য খাদ্য মুখে দেয় না। এত ত্যাগ, ধৈর্য স্বীকার করে সিয়াম পালন করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। তাই এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِه**. 'নিশ্চয়ই সিয়াম আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব'। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯।)

এছাড়াও রমযানের আরও কিছু গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

- **সামগ্রিক কল্যাণ :** ইসলামে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিয়ামের প্রভাব অতিশয় কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن**- 'আর তোমাদের সিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে' (বাক্বারাহ ২/১৮৪)।
- **কুরআন নাযিলের মাস :** পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এ মাসে সিয়ামের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'রমযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। যা মানুষের হেদায়াত এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সত্য- মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি রমযান মাস পায় সে যেন সিয়াম পালন করে' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)।

৩.৪ রমযানের তাৎপর্য

রমযান শব্দের শাব্দিক অর্থ দহন বা দগ্ধকরণ। রমযান মাস মুসলমানদের মাঝে তাদের সমস্ত পাপ মোচন করার জন্য আসে। কারণ মানব জীবনের দু'টি ধারা রয়েছে- সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজ জীবনে ঐক্য-সংহতি, প্রেম-মৈত্রী ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরদিকে কুপ্রবৃত্তি আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, একক ও অসহায় করে তোলে। এভাবে ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। লোভ, মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে এগুলোর দহনের জন্যই এ দুনিয়ায় আল্লাহ রমযানের প্রবর্তন করেছেন, যাতে এ দহনের ফলে মানুষ এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে; সে যাতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কুরআনুল কারীমে ও

সহীহ হাদীসে এজন্যই সিয়ামের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেও এর ফযীলত ও কার্যকারিতার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে ধনী ও নির্ধন এক সারিতে চলে আসে। সারা বৎসর যারা ধনীদের দ্বারে হাত পেতে কষ্টে দিনাতিপাত করেছে তারা যেমন সিয়াম পালন করে, যারা নানাবিধ চর্বচোষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্য-পানীয় দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তারাও অন্ন ও সংস্থান থাকা সত্ত্বেও সিয়াম পালন করে। এখানে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এটিই মানবতার মৌলিক ঐক্য। এ মাসে কাম প্রবৃত্তির পরিচর্যা, লোভের বশীভূত হয়ে অন্যের জিনিসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনীয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব আবর্জনা আমাদের মানসে সঞ্চিত হয়ে তাকে আবিল করে তোলে, তা থেকে পবিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে এই সিয়াম। সিয়ামের অর্থ কেবল উপবাস থাকা নয়; বরং সকল প্রকার কামনা-বসনা, সুখ-সম্ভোগ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম(রোজা)।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

‘ -رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَه ,

সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭ ‘সালাত’ অধ্যায়।)

৩.৫ রোজার উদ্দেশ্য

রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা। এটি একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা ব্যক্তিকে আত্মসংযম, ধৈর্য এবং নৈতিকভাবে উন্নত করতে সাহায্য করে। রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ থেকে দূরে থাকা এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩.৬ কুরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার উদ্দেশ্য

রোজার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা। ক্ষুধা-পিপাসার মাধ্যমে মানুষ তার নফসকে সংযত করে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকে। এর ফলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় এবং প্রকৃত তাকওয়া অর্জিত হয়।

৩.৭ তাকওয়া অর্জন

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল; যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি ও সংযম) অর্জন করতে পারো" (২:১৮৩) । রোজা একমাত্র ইবাদত যা প্রকাশ্যে প্রমাণ করা যায় না। গোপনে পানাহার করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে বিরত থাকাই হলো তাকওয়ার সর্বোচ্চ উদাহরণ। রোজাদার যখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করেন, তখন তাঁর আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

৩.৮ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। রমজানে বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরজের সওয়াব এবং ফরজের মাধ্যমে ৭০ গুণ বা তারও বেশি সওয়াব লাভ করে, যা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

৩.৯ আত্ম-শুদ্ধি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

হাদিসে বলা হয়েছে, যারা রোজা রাখে, তারা শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকে না, বরং খারাপ কাজ ও পাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে। রোজার মাধ্যমে শরীর দুর্বল হলেও আত্মা শক্তিশালী হয়। রোজাদার ইবাদত-বন্দেগি, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, যা তার হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। রোজা মানুষকে তার প্রবৃত্তির তাড়না (নফস) নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থাকা মানুষকে দীর্ঘ এক মাস ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ দেয়।

৩.১০ পাপ থেকে বিরত থাকা

কেউ যদি রোজা রেখেও মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ পরিত্যাগ না করে, তবে তার শুধু উপবাস থাকার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী ৬০৫৭, ইবনে মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ, মুসনাদ ২/৪৫২)

৩.১১ ধৈর্য ও সংযম

রোজা ধৈর্য ও সংযম ধারণ করার একটি মাধ্যম, যা ব্যক্তিকে আত্ম-শৃঙ্খলা ও নৈতিক উন্নতির শিক্ষা দেয়। রোজা মানুষকে চরম ধৈর্য ও সবরের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন এবং তাদের অগণিত প্রতিদান দেন। রমজান মাস শক্তি অর্জন ও দানের মাস। এ মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তখন তিনি এবং সমস্ত মুসলমান সিয়াম অবস্থায় ছিলেন, আর এ রমজানেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়ছিল। এ সমস্ত যুদ্ধে ইসলামের পতাকা সমুন্বত হয়েছিল, মূর্তি এবং পৌত্তলিকতার পতাকা অবনমিত হয়েছিল। এ মাসে মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ জিহাদ এবং কুরবানি সংঘঠিত হয়েছে। রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর সাহাবারা অধিক পরিমাণে শক্তি, সজিবতা এবং ইবাদতের জন্য ধৈর্য ধারণ করার উদ্যম অনুভব করতেন, তাইতো রমজান মাসকে সৎকাজ, ধৈর্য ও দানের মাস বলা হয়। রমজান দুর্বলতা, অলসতা, ঘুমানোর মাস নয়। কোন কোন সিয়াম পালনকারীকে হাত পা ছেড়ে দিয়ে, দিনের বেলায় ঘুমাতে, কাজ কম করতে দেখা যায়। এমন আচরণ সিয়ামের তাৎপর্যের বিরোধী। সিয়ামের উদ্দেশ্যের সাথে মিলে না।

৩.১২ রোজার ফজিলতঃ

রোযার ফযিলত অনেক বেশি এবং এটি একটি বিশেষ আমল। সহীহ হাদীস অনুযায়ী, রোযা আল্লাহর জন্য খাস এবং তিনি নিজেই এর প্রতিদান দেবেন, যা অন্য সব আমলের সওয়াব থেকে অসংখ্য গুণ বেশি হতে পারে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দ—ইফতারের সময় এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৮৯৪) ।

আবু সঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সাওম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৪০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৩।)

❖ রোজার প্রতিদান আল্লাহ তা’আলা নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেনঃ

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোজার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোজার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন- “মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত।” আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— “কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। (সহীহ মুসলিম-১১৫১; মুসনাদে আহমদ-৯৭১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ-১৬৩৮)

অন্য বর্ণনায় আছে-

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(স.) ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ তা’আলা বলেন- বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ” (সহীহ বুখারী-১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ-৯৯৯৯)।

রোজা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়- আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেছেন, “প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোজা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।” (সহীহ বুখারী-১৯০৪)

রোজার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোজা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। (সূরা যুমার: ১০)
সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

❖ আল্লাহ তাআলা রোজাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেনঃ

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত-
আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোজার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। - (মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস: ৫০৯৫) ।
হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—
আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না। - (মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস: ৫০৯৩) ।

❖ পাপ মোচনের মাধ্যমঃ

রোজার অন্যতম প্রধান ফজিলত হলো, এটি পাপ মোচনের মাধ্যম। এমনকি বিগত জীবনের গুনাহও মাফ হয়ে যেতে পারে যদি কেউ ঈমান ও ইখলাসের সাথে রোজা রাখে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

“যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১)

❖ রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেঃ

রমজান জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ প্রতিদিন ইফতারের সময় কতিপয় বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং তা প্রতি রাতেই হয়ে থাকে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৪৩) ।
রোজা হলো এমন এক ঢাল, যা বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল করে রাখে। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّار

“সিয়াম হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল, যা দ্বারা বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে।”(আহমাদ হা/১৫২৯৯; তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৮১)

❖ **জান্নাতের দরজা "আর-রাইয়ান"-ঃ**

রোজাদারদের জন্য জান্নাতে রয়েছে একটি বিশেষ দরজা, যার নাম "আর-রাইয়ান"। সাহল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

“জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم

"যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাঁকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব, যে সালাত আদায়কারী, তাঁকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। সে মুজাহিদ তাঁকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে সাওম পালনকারী, তাঁকে রাইয়্যাব দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী তাঁকে সদকা দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, সব দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাঁদের মধ্যে হবে।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৮৯৭)

❖ **দোয়া কবুলের মাসঃ**

রমজানের অন্যতম বড় নিয়ামত হলো, এই মাসে দোয়া কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া আল্লাহ সরাসরি কবুল করেন। রোজাদারের উচিৎ, ইফতার করার আগে পর্যন্ত রোজা থাকা অবস্থায় বেশী বেশী করে দুআ করা। কারণ, রোজা থাকা অবস্থায় রোজাদারের দুআ আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: রোজাদারের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া।" (তিরমিজি: ৩৫৯৮)

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَد

“সাওম পালনকারীর ইফতারের সময় দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না।” (মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮)

❖ সিয়াম ও কুরআনের সুপারিশঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন—

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“কিয়ামতের দিন সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।” (মুসনাদ আহমদ-৬৬২৬)।
রোজা ও কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। নবীজি (সা.) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।’ (মুসনাদে আহমদ: ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম: ২০৮০)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط .: منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস: ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস: ১৯৯৪)

❖ মুমিনের খুশির মাসঃ

রমজান হলো মুমিনের আনন্দের মাস। মহানবী (সা.) বলেন, ‘রোজাদারের জন্য আছে দুটি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আরেক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭৪৯২)

❖ রোজাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্তঃ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১)

❖ **রোজাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবেঃ**

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৪২৯)

❖ **আত্মশুদ্ধি ও সংযমঃ**

রোজা আত্মশুদ্ধি ও সংযমের একটি মাধ্যম। এটি মানুষের কুপ্রবৃত্তি দূর করে, আত্মাকে দহন করে এবং ঈমানের শাখাপ্রশাখা শক্তিশালী করে।

❖ **আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমঃ**

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪০;) রোজা রাখার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

❖ **অন্তরের ক্রোধ দূর করাঃ**

রোজা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়।

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه ،صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر (احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোজা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোজা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। (-মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৬৫২৩) । মাসের তিন দিন রোজা রাখলে অন্তরের ক্রোধ (ঘৃণা ও হিংসা) দূর হয়।

❖ **সিয়াম আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢালঃ**

ইমাম আহমাদ রহ. তার কিতাবে জাবের রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: (إنما **الصيام جنة، يستجن بها العبد من النار**)। সিয়াম প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচার জন্য ঢাল এর মাধ্যমে বান্দা আগুন থেকে মুক্তি পায়। ইবনে মাসউদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء { [أخرجه البخاري ومسلم].

হে যুবকেরা! যে সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করে এবং যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। যে বিবাহের সামর্থ রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা এটি তার জন্য সুরক্ষা। (বুখারী মুসলিম) ।

❖ সিয়াম জান্নাতের পথঃ

ইমাম নাসাঈ রহ. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে এমন বিষয়ের নির্দেশ দেন যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে প্রতিদান দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি অসাল্লাম বলেন: **عليك بالصيام فإنه لا مثل له** .. তুমি সিয়াম পালন কর। কেননা এর কোন তুলনা নেই। জান্নাতে একটি দরজা আছে সেখান দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারী প্রবেশ করবে। সাহল ইবনে সাআদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

إن في الجنة باباً يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد { [أخرجه البخاري ومسلم].

জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়ান। কিয়ামত দিবসে সেখান দিয়ে সিয়াম পালনকারী প্রবেশ করবে। সে দরজা দিয়ে অন্য কেহ প্রবেশ করবে না। বলা হবে; সিয়াম পলনকারী কোথায়? তারা দাঁড়াবে, তারা ছাড়া আর কেহ প্রবেশ করবে না। তারা প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর কেহ সে স্থান দিয়ে প্রবেশ করবে না। (বুখারী মুসলিম)।

সিয়াম পালনকারীর জন্য সিয়াম সুপারিশ করবে: ইমাম আহমদ রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন:

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان).

সিয়াম এবং কোরআন বান্দার জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী হবে, সিয়াম বলবে, হে প্রভু আমি তাকে দিনের বেলায় খাওয়া এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিবৃত্ত রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তাআলা বলবেন: তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হল।

❖ সিয়াম গুনাহের ক্ষমা এবং কাফফারা হিসাবে গৃহিত হয়:

কেননা ভাল কাজ অন্যায়কে মুছে দেয়। আবু হুরায়রা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

[من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه } [رواه البخاري ومسلم.

যে রমজানে ঈমান এবং এহতেসাবের সাথে সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেবেন। (বুখারী মুসলিম)

সিয়াম ইহকাল এবং পরকালের সৌভাগ্যের কারণ: আবু হুরাইরা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

{ وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، والخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم}].

সিয়াম পালনকারীর দুটি খুশি, প্রথম খুশি যখন সে ইফতার করে, আর এক খুশি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশক আম্বরের চেয়ে অধিক প্রিয়। (বুখারী মুসলিম)

৩.১৩ রোজা রাখার শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা

রোজা শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের অংশ নয়; বরং এটি বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতিরও একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এর রয়েছে শারীরিক ও মানসিক উপকারিতাও।

৩.১৩.১ রোজা রাখার শারীরিক উপকারিতা

রোজার শারীরিক উপকারিতা অনেক। রোজা থাকলে দিনের বেশিরভাগ সময় না খেয়ে থাকতে হয়। এতে আমাদের শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট ও চর্বি কমে যায়। সেই সঙ্গে শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকারক টক্সিন কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়। শরীরকে বিষমুক্ত করার একটি কার্যকরী উপায় হলো রোজা। যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন, তারা সহজেই রমজান মাসের এ সময়টা কাজে লাগাতে পারেন। কারণ, রোজা রাখার পাশাপাশি ইফতার ও সেহরিতে পুষ্টিকর খাবারের প্রাধান্য দিলে খুব সহজেই এই সময়ে আপনি আপনার ওজন কমিয়ে ফেলতে পারবেন। রমজানে নিয়মিত রোজা রাখার ফলে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। রোজায় পেট খালি থাকার কারণে খাবার হজমের অ্যাসিড এই সময় ধীরগতিতে নিঃসরিত হয়, যা হজম শক্তিজনিত নানা সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রোজার কোনো বিকল্প নেই। কারণ দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে কোলেস্টেরল ও গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার বদভ্যাস যাদের আছে, তারা নিয়মিত রোজা রাখার কারণে এই বদভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তাছাড়া যেকোনো নেশাদ্রব্য থেকে মুক্তি পেতে রোজা রাখার অভ্যাস কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৩.১৩.২ রোজা রাখার মানসিক উপকারিতা

রোজার শারীরিক উপকারিতার সঙ্গে রয়েছে মানসিক উপকারিতাও। রোজা যেহেতু ধর্মীয় একটি ইবাদত তাই নিয়মিত রোজা রাখার ফলে মানসিক প্রশান্তি অনুভব করা যায়। এ সময় স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়, যা ব্রেনের কর্মক্ষমতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার অভ্যাস সঠিক পথে চলার শক্তি জোগায়। দীর্ঘসময় নিজেকে সংযত রাখার কারণে সহজেই পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। নিয়মিত রোজা পালন ও ধর্মপথে থাকায় মানুষ নিজের আত্মপর্যালোচনা এবং চিন্তা-চেতনাকে উন্নত করার সুযোগ পায়। রোজার গুরুত্ব অনুধাবন করে ডা. আইজাক জেনিংস বলেছেন, যারা আলস্য ও গোঁড়ামির কারণে এবং অতিভোজনের কারণে নিজেদের সংরক্ষিত জীবনীশক্তিকে ভারাক্রান্ত করে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়, রোজা তাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। রোজা রাখার ফলে শরীর নানা ধরনের চাপ নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। ফলে রোজাদার ব্যক্তি সাধারণত কখনো খিঁচুনি এবং মানসিক অস্থিরতার মুখোমুখি হন না। কোরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্বের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও ইতিবাচকভাবে জীবনদর্শনের জন্য রমজান মাসে রোজা রাখার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

৩.১৩.৩ রোজার যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা

যে রোজা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমনঃ-

১। রোজা হল এক এমন ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আশা করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশতলাভ। এতে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, সে নিজের প্রিয় বস্তুর উপর প্রভুর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের উপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোজাদার যথানিয়মে রোজা পালন করলে রোজা তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।’’ (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)। সুতরাং রোজাদার রোজা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে ‘তাকওয়া’ আনবে -এটাই বাঞ্ছিত। আর ‘তাকওয়া’ হল সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হল রোজার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোজার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।’’ (বুখারী ৬০৫৭, ইবনে মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ, মুসনাদ ২/৪৫২, ৫০৫, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ ৬-৭পৃঃ)

৩। রোজা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোজাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়িত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের সবভাব-প্রকৃতিতে রোজা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার

করে। রোজার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে যায়। রোজাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টাও করতে পারে না। এটা কি করে হতে পারে যে, রোজাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোজায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোঁকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোঁকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন। সুতরাং রোজা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোজাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। (ফাইযঃ ২২৪পৃঃ)

৪। রোজা রোজাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোজা তাকে এক মহান ইবাদতে মশগুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং সে না চুগলী করে, না গীবত। না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল। না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ। না অসার বকে, না ফালতু। কোন প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে প্রকৃত রোজাদার রোজার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে। (সাওমু রামাযান ৪০পৃঃ)

৫। রোজা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন দেয়। জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে রোজাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না। সুতরাং রোজা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোজা রোজাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার 'ট্রেনিং' দেয়। রোজার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন। আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোজা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোজাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোজা রোজাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোজা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ। (সাওমু রামাযান ৪০পৃঃ)

৭। রোজার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোজা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোজা রাখা যায় না। বলা বাহুল্য, রোজা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোজাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোজাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোজা নয়। রোজাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোজা নয়। রোজা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।’’ (আহমাদ, মুসনাদ ২/৫০৩)

৮। রোজা রোজাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-নোকসান ওজন করে থাকে তা হল পারলৌকিক। রোজার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এইভাবে রোজা রোজাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে; যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে। (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১০পৃঃ)

৯। রোজা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোজা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন, (**وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ**)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭) বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোজা রাখা মকরূহ। অতএব রোজা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোজার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর

নির্দেশের আনুগত্য। তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোজা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে। (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১০পৃঃ)

১০। রোজা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোজা ফরয করেছেন। কারণ, এরই মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন। (ইতহাফ ৪১পৃঃ)

১১। রোজা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোজা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। (কুরআনুল কারীম ১১/১১৪)

আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোজা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।" (বুখারী ১৭৯৬, মুসলিম ১৪৪নং)। অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোজা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়। পরন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোজা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" (বুখারী ৩৮, মুসলিম ৭৬০নং)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান - এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" (আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী)

১২। রোজা রোজাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোজা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়। বলা বাহুল্য, রোজা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। (কুরআনুল কারীম ৩৯/১০)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌনক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করাই হল ধৈর্যের শেষ পর্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করতে পারঙ্গম হবে, সে

ব্যক্তির জন্য অন্য শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে শুভপরিণাম।
মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا)

“যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে- তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্ন) স্থায়ী বেহেশত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে।” (কুরআনুল কারীম ১৩/২২-২৩)

১৩। রোজা হল ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। (ত্বাবারানী, মু’জাম, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮৬৭নং) একটি মাত্র রোজা জাহান্নামকে রোজাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়। [(বুখারী ২৬৮৫, মুসলিম ১১৫৩নং)] সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান মাসের রোজা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোজা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৪। রোজা হল চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোজা রোজাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, “হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী।” (বুখারী ৪৭৭৯, মুসলিম ১৪০০, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০৮০নং)

১৫। রোজা হল বেহেশ্তেগামী পথ। আবূ উমামাহ (রাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, “তুমি রোজা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই।”[(নাসাঈ ২২২১নং)] তাছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রোজাদারকে বেহেশ্তে ‘রাইয়ান’ নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। [(বুখারী ১৭৯৭, মুসলিম ১১৫২নং)] আর ‘রাইয়ান’ (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোজাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোজা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে “সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেশ্তী পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।” (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৫১৮৪নং)

১৬। রোজা পালনের মাধ্যমে রোজাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়! [(বুখারী ১৮০৫, মুসলিম ১১৫১নং)] অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং

ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

১৭। রোজাদার ব্যক্তির দুআ রোজা রাখা অবস্থায় কবুল হয়ে থাকে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''তিন প্রকার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে; রোজাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।'' (বাইহাকী শুআবুল ঈমান, ইবনে আসাকের, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৭৯৭নং)

১৮। রোজা কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনে রোজাদারের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে; বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নাও।' অতঃপর মহান প্রভু তার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন। (আহমাদ, মুসনাদ ২/১৭৪, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৫৫৪)

১৯। রোজা রোজাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''রোজাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।'' (বুখারী ১০৮৫, মুসলিম ১১৫১নং)। রোজাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হল আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকেঃ-
(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোজাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।
(খ) সে মুহূর্তে রোজাদার তার একটি রোজা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে। (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১৭পৃঃ)। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোজাদার রোজা রেখে থাকে।

২০। রোজা হল পরহেযগার ও নেক লোকদের ট্রেনিং-ময়দান; যার মাঝে আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোজা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত। রোজার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক। (ফাইযঃ ১০৭পৃঃ)

২১। রোজা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে 'আমানতদারী'র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোজা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক

ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই। সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে?
যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না। (সাওমু রামাযান ৩৯পৃঃ)

২২। রোজা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিক্র ও শুক্র করতে অভ্যাসী করে।

২৩। রোজা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে। (ফাইযঃ ১০৮পৃঃ)

২৪। রোজা হল আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোজা হল পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও। রোজার আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন, (**ولعلَّكُمْ تَشْكُرُوْن**) অর্থাৎ, যাতে তোমরা শুক্র আদায় কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)
রোজাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সে সেই গরীব-নিঃসবদের কষ্টের কথাও উপলব্ধি করে; যারা ক্ষুধার সময় পেটে এক মুঠো অন্নও যোগাড় করতে সমর্থ নয়। এর ফলে ঐ উপলব্ধি তাকে তাদের জন্য দান-খয়রাত করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, নিজের দেখা বিষয় শোনা বিষয়ের মত নয়। নিজের দেখা ও পরীক্ষা করা বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতি জন্মে অধিক। যেমন একজন ঘোড়সওয়ার লোক পথ চলার কষ্ট ততক্ষণ অনুভব করতে সক্ষম নয়; যতক্ষণ না সে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলে দেখেছে। (ফাইযঃ ১৪পৃঃ, সাবউনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ৪নং)

২৫। রোজার মাধ্যমে রোজাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে। (ইতহাফ ৪৫পৃঃ)

২৬। রোজাতে রোজাদার ফিরিশ্তামন্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফিরিশ্তামন্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না।

২৭। রোজা রোজাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোজাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তেলাঅত ও যিকর করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোজা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়।

২৮। রোজার মাসে রোজাদারের দ্বীনী জ্ঞান বর্ধিত হয়ে থাকে। কারণ, রমযান হল ইবাদতের মাস, আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণা করার মাস। কুরআন মাজীদ তেলাঅত করা ও শোনার মাস। (সাওমু রামাযান ৪১পৃঃ)

২৯। এ মাসে দ্বীনের আহবায়কদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ মাসে অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বা তার জীবনে প্রথমবার প্রবেশ করে, কেউ বা অনেক দিন হল মসজিদ ত্যাগ করেছিল। এ সময় তাদের হৃদয় এক প্রকার দুর্লভ নম্রতা ও তরঙ্গায়িত ভক্তিতে গদ্গাদ্ করে।
সুতরাং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মন-গলানো উপদেশমালা এবং উপযুক্ত ওয়ায ও দর্স প্রয়োগ করে তাদের ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা উচিৎ। আর এ কাজে অবশ্যই সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহায়তা হয়ে থাকে। (সাওমু রামাযান ৪১পৃঃ) । পরন্তু রমযানের রোজা বছরান্তে একবার ফরযরূপে এসে থাকে। যা হজ্জের মত জীবনে একবার নয়। যাতে প্রত্যেক বছর ঈমানী দর্সের পুনরাবৃত্তি হয় এবং রোপিত ঈমানী বৃক্ষ সহসায় বেড়ে ওঠে।

৩০। রোজার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন হয়ে থাকে। রোযা হল মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোজা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তারা হল একটি দেহের মত।

৩১। রোজার উপবাস সবাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। রোজাতে তুলনামূলকভাবে কম খাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে পাকস্থলীকে বিরতি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের মেদ, ক্লেদ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়।[(ফসূলঃ ৮পৃঃ)] আর একথা বিদিত ও স্বীকৃত যে, শরীরের মধ্যে পেট হল রোগের বাসা এবং ব্যবস্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এ কথা বহু চিকিৎসকই স্বীকার করেছেন যে, রোজাতে রয়েছে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা, বিশেষ করে যক্ষ্মা, ক্যানসার ইত্যাদি। রোজায় রয়েছে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, হ্যাপাটাইটিস, জন্ডিস, প্লীহা, যকৃৎ, বদহজম, প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা। রোজা ফরয হয়েছে সুস্থ মানুষের উপর। যাতে আক্রমণের পূর্বেই ঐ সকল বা আরো অজানা বহু রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়। তাছাড়া বহু গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার; যা মহান সৃষ্টিকর্তা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী জীবজগতের জন্য অনিবার্য করেছেন। আর তা শুধু এই জন্য যে, যাতে করে প্রাণীজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, বাঁচার জন্য শক্তি পায় এবং নিজ নিজ বংশবিস্তারে যথানিয়মে সক্রিয় থাকতে পারে।
জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের উপবাস করার কথা অনেকের অজানা নয়। কোন কোন জন্তু লম্বা সময় ধরে প্রায় কয়েক মাস যাবৎ উপবাস করে। কোন কোন জন্তু কয়েক দিন ধরে উপবাস করে। বরং উদ্ভিদজগৎও

উপবাস পালন করে থাকে। যার ফলে নতুন, সুন্দর ও লকলকে পাতা বের হয়ে আসে এবং শান্ত শীতে নিদ্রার পর ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে শক্তিশালী ও সজীবরূপে শুরু হয় বৃক্ষ-তরুলতার আনন্দময় বসন্তকাল। ডাঃ সলোমন মানব-দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষাকল্পে মধ্যে মধ্যে ডকে নিয়া চুল্লি হইতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমনটা আবশ্যক - উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী হইতে অজীর্ণ খাদ্যটি নিষ্কাশিত করাও তেমনটা দরকার।' (বাংলা মিশকাত ৪/২৬৩)

৩২। রোজা মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কারণ, পেট খালি থাকলে চিন্তা-গবেষণা নির্মল হয় এবং মন-মগজের কর্ম সুন্দর হয়। পক্ষান্তরে যারা ধারণা করে যে, রোযা মানুষের খরচ বাড়ায় এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় এই রোজার মাসে, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, খাবারের নানান ভ্যারাইটিজ তৈরী করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাবার প্রস্তুত করা, রমযানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরন ও বরনের খাদ্যপণ্যের বিপণন ঘটানোতে ইসলামের অনুমোদন নেই। বরং তা হল অপচয়। আর অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ; রমাযানে এবং অন্য মাসেও। বলাই বাহুল্য যে, রোজাতে রয়েছে মঙ্গলই মঙ্গল। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সেই মঙ্গল অনস্বীকার্য। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে সেই মঙ্গলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, (**وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ**) অর্থাৎ, তোমাদের রোজা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

৩.১৪ রোজার বিশেষ ফজিলত

৩.১৪.১ সাহরি

সাহরি হলো রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে পানাহার করা, যা রাসুল (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমল ও বরকতময় কাজ। সাহরি খাওয়া সুন্নত। সাহরিতে রয়েছে বরকত ও কল্যাণ। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরাও রোজা পালন করতো কিন্তু তারা ভোররাতে সাহরি গ্রহণ করতো না। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোররাতে সাহরি খাওয়ার বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- **تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً**. তোমরা সাহরী কর। কেননা সাহরীর খাবারে বরকত রয়েছে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৫)। আরেক হাদীসে এসেছে-

সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। অতএব তোমরা তা ছেড়ো না; এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী গ্রহণ কর। কেননা যারা সাহরী খায়, আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। -(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১০৮৬)।

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ.

আমাদের রোজা ও আহলে কিতাবের (ইহুদী-নাসারার) রোজার মাঝে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৬)।

অর্থাৎ আমরা সাহরী খাই, তারা খায় না।

ইহুদীদের রোজার সাথে আমাদের রোজার এটি একটি বড় পার্থক্য; কিন্তু 'সাহরী খেলে ইহুদীদের সংখ্যানুপাতে সওয়াব লাভ হবে' বা 'না খেলে স্বভাব-চরিত্র ইহুদীদের ন্যায় হয়ে যাবে'- এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই।

৩.১৪.২ ইফতার

রোজা আল্লাহর সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল। এর প্রতিদান স্বয়ং তিনি নিজ হাতে দেবেন বলে হাদিসে কুদসিতে ঘোষণা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭৪৯২)

সারা দিন রোজা রাখার পর ইফতারের সময়টা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নিয়ামত। এ সময় রোজাদারের হৃদয়-মনে সীমাহীন আনন্দের সমীরণ বয়ে যায়। এটা সাময়িক আনন্দ। প্রকৃত আনন্দ তো হবে সেদিন, যেদিন রোজাদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাক্ষাতে ধন্য হবে। হাদিসে এসেছে, 'রোজাদারের আনন্দ দুটি, যা তাকে আনন্দিত করে। যখন সে ইফতার করে, আনন্দিত হয় এবং যখন সে স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৭৮৩)। ইফতারের সময়টা খুবই বরকতপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা এ সময় রোজাদারের দোয়া কবুল করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রোজাদারের দোয়া, যতক্ষণ না সে ইফতার করে, ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)। সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফতার করা অনেক ফজিলতপূর্ণ ও কল্যাণকর। যারা সময় হওয়ার পর দ্রুত ইফতার করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের পছন্দ করেন। তিনটি বস্তু আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তার মধ্যে একটি হলো দ্রুত ইফতার করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি বস্তু আল্লাহর প্রিয়; সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা, শেষ সময় পর্যন্ত সাহরিকে বিলম্ব করা এবং নামাজে (দাঁড়ানো অবস্থায়) এক হাতের ওপর অপর হাত রাখা।' (সহিহুল জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩০৩৮)। খেজুরের মাধ্যমে ইফতার করা উত্তম। এটি স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। এতে সারা দিনের ক্লান্তি এবং ক্ষুধার দুর্বলতা দূর হয়।

সালমান ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ রোজা রাখলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। যদি খেজুর না থাকে তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা, পানি অতিশয় পবিত্র বস্তু।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ২৩৫৫)।

অন্য হাদিসে আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) মাগরিব নামাজের আগে তরতাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তরতাজা খেজুর না থাকত, তাহলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাও না থাকত, তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।' (জামে তিরমিজি, হাদিস: ৬৯৬)

৩.১৪.৩ ইফতার তাড়াতাড়ি করা:

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"মানুষ যতদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।" (সহিহ মুসলিম-১০৯৮)

৩.১৪.৪ ইফতারের সময় দোয়া করা

ইফতারের সময় হচ্ছে দো'আ কবূল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্ত। কেননা হাদীসে এরশাদ হয়েছে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, **إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَد**

"সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময়কার দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭৪৩)।

ইফতার করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীজি সাল্লাল্লামের অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সুন্নতসম্মতভাবে ইফতার করা ও করানোর তওফিক দান করুন। আমিন।

৩.১৫ তারাবীহ

ত্যাগ ও সংযমের পবিত্র মাস রমজান। আর এই রমজান মাসে ফরজ রোজা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সুন্নত ইবাদত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিদিন রাতের তারাবিহ নামাজ।

৩.১৫.১ তারাবিহ নামাজের পরিচয়

তারাবিহ নামাজ রমজান মাসের একটি বিশেষ ইবাদত। এ নামাজ নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর সুন্নত। তবে পুরুষের জন্য তারাবিহর জামাত করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। আর নারীরা জামাত ছাড়াই একা একা পড়ে নেবে। রমজান মাসে তারাবিহ নামাজের মধ্যে একবার কোরআন খতম করা সুন্নত। এশার নামাজের চার রাকাত ফরজ ও দুই রাকাত সুন্নতের পর এবং বিতর নামাজের আগে দুই রাকাত দুই রাকাত করে দশ সালামে বিশ রাকাত নামাজ আদায় করতে হয়। কিন্তু তারাবিহ নামাজ অবশ্যই এশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে। আরবিতে 'তারাবিহ' শব্দের অর্থ আরাম বা বিশ্রাম করা। তারাবিহ নামাজ পড়াকালে প্রতি চার রাকাত পর কিছু সময় বসে আরাম করার বিধান ইসলামী শরিয়তে রয়েছে। তাই এই নামাজকে তারাবিহ নামাজ বা সালাতুত তারাবিহ বলা হয়। প্রতি চার রাকাত পরপর আরাম করার সময় কোরআন তেলাওয়াত, জিকির, দরুদ শরিফ ইত্যাদি পাঠ করা যেতে পারে। তারাবিহ নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে অবশ্য গুনাহগার হবে। কিন্তু তারাবিহর কাজা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সুন্নতের কাজা নেই। (ফাতাওয়া শামি : ২/৪৫; আহসানুল ফাতাওয়া : ৩/৫২৪)

৩.১৫.২ তারাবিহ নামাজের ফজিলত

রমজান মাসে রাসুল (সা.) নিজে তারাবিহ নামাজ পড়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারাবিহ নামাজ জামাতে আদায় করা এবং এতে কোরআন শরিফ খতম করা বড় সওয়াবের কাজ। তবে ঘরে বা মসজিদে সুরা কেরাতের মাধ্যমে আদায় করলেও সওয়াব পাওয়া যায়। রমজানে তারাবিহ নামাজ আদায়কারীর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

হাদীস শরীফে এসেছে,

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, **مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী, ২০০৮)। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় তারাবীর সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (সহিহ বুখারী - ২০০৯)

হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে এবং আল্লাহর দরবারে আজর ও সাওয়াবের আশা পোষণ করে রমযানের রাতে নামায, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকবে, আল্লাহ তার পিছনের যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে তারাবিহর নামাজ আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমিন।

৩.১৬ মাহে রমজানে কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

রমজান মাস হলো কুরআন অবতীর্ণের মাস। এই মাসেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য হিদায়াত ও জীবনদিশারী হিসেবে কুরআন নাজিল করেছেন। তাই রমজানে কুরআনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা, তিলাওয়াত ও শ্রবণ করা এক বিশেষ ইবাদত ও বরকতের আমল। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা মাহে রমযানের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

আল্লাহ তাআলা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“রমজান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে—মানবজাতির জন্য হিদায়াত, স্পষ্ট নির্দেশনা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।” (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৫)।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রমজান মাসের মূল বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য কুরআনকে কেন্দ্র করেই।

সহিহ বুখারিতে এসেছে-

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, প্রতি বছর জিব্‌রীল (আঃ) নবীজি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর সঙ্গে একবার কুরআন মাজীদ শোনাতেন ও শুনতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে দু'বার শুনিয়েছেন। প্রতি বছর নবীজি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৯৯৮)। এই আমল প্রমাণ করে যে, রমজান মাসে কুরআনের পুনরালোচনা ও বেশি তিলাওয়াত করা সুন্নাহ।

কুরআন তিলাওয়াতের কিছু ফজিলত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. রমজান ও কুরআনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য: রমজানকে বলা হয় “শাহরুল কুরআন” বা কুরআনের মাস। রমজান মাসে কুরআন তেলাওয়াত খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল । রমজানের রোজা রেখে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার সুযোগও রয়েছে । কুরআন তেলাওয়াত রমজানের অন্যতম হক। কেননা রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস এবং রমজান মাসের সঙ্গে কোরআনের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

২. রমজানে তিলাওয়াতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়: কারণ এটি বরকতের মাস; প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান অনেকগুণ বেশি হয়। নবীজি (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পড়ল, তার জন্য রয়েছে একটি নেকি। আর একটি নেকি ১০ নেকি সমতুল্য। আমি বলছি না, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।’ (তিরমিজি)

অন্য সময়ের তুলনায় রমজান মাসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, রমজান মাসের নফল ইবাদত অন্য মাসের ফরজ সমতুল্য। আর ফরজ ইবাদত অন্য মাসের ৭০টি ফরজ সমতুল্য। রমজানের প্রত্যেক রাতে নবীজি (সা.) জিবরাইল (আ.)-এর কাছে পবিত্র কোরআন শোনাতেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'জিবরাইল (আ.) রমজানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং নবীজি (সা.) তাঁকে পবিত্র কোরআন শোনাতেন (বুখারি) । এ হাদিস থেকে রমজানে অধিক পরিমাণে কোরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বোঝা যায়।

৩. **রাতের তারাবিহতে কুরআন শ্রবণ:** সাহাবায়ে কেরাম রমজানে জামাতে দাঁড়িয়ে কুরআন শ্রবণ করতেন, যা রমজানের বিশেষ ইবাদত।

৪. **কুরআন তিলাওয়াত রোজার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে:** রোজা দেহকে সংযম শেখায়, আর কুরআন আত্মাকে প্রশান্ত করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অবস্থাও এর ভিন্ন ছিল না। রমজান এলে তারা তাদের তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বছরের অন্যান্য সময় যত দিনে কুরআন খতম করতেন, রমজানে তার চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করতেন। পাশাপাশি তারাবীহ এবং কিয়ামুল লাইলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের আমল জারি থাকত। সালাফে সালেহীন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের জীবনীতেও এমনটাই চোখে পড়ে। মাহে রমযানে তারা সকলেই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। কেয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য পবিত্র কোরআন সুপারিশ করবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি (সা.) এরশাদ করেন, 'রোজা ও কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসনাদে আহমদ)

৩.১৭ রমজানের দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

রমজান মাস হলো রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য নেক আমলের দরজা খুলে দেন। রমজানে দান-সদকা করা অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ফজিলতপূর্ণ। কারণ, এ মাসে প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে দানশীল। মাহে রমযানে তিনি আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। বিশেষত যখন জিবরীল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরীল আ. মাহে রমযানের প্রতি রাতে তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং কুরআনের মুযাকারা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা উন্মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেড়ে যেত। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২২০)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, রমজান মাসে দান করা নবীজী (সা.) এর প্রিয়তম আমলগুলোর একটি ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

“যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই বীজের মতো- যা সাতটি শিষ উৎপন্ন করে, প্রত্যেক শিষে থাকে একশ’টি দানা। আল্লাহ যাকে চান, তার জন্য (সওয়াব) বহুগুণে বৃদ্ধি করেন।” (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ২৬১)।

রমজান মাসে এই প্রতিশ্রুত সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **والصدقة تُطفِئُ الخَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النار**. “সদকা পাপ মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়”। (সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৬১৪) । দানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সাতজনকে তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, তাদের একজন হবে সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানবে না ডান হাত কী দান করেছে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৬০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩১)

৩.১৮ ইতিকাফ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ। রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ একটি অনন্য ইবাদত। এটি এমন এক আমল, যা বান্দাকে দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর ঘরে, শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবিষ্ট হতে শেখায়। ইতিকাফ মানে হলো— মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা। রমজানের শেষ দশক বিশেষ ফজিলতপূর্ণ, কারণ এই সময়েই রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। তাই নবী (স:) এই সময়ে নিয়মিত ইতিকাফ করতেন। দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থানের এই যে বিধান- নিঃসন্দেহে তা বান্দার প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় ইহসান। বান্দার উচিত এই মহান বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আবেগ ও মহব্বতের সাথে এই আমলের প্রতি উৎসাহী হওয়া। ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। - সূরা বাকারা (২): ১২৫। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ করতেন। তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০২৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৭৪)।

ইতিকাফ হলো, আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আতা (রহ.) বলেন যে কোনো ব্যক্তি এসে কারো দরজায় কড়া নাড়ল এই বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে এখান থেকে এগোবে না। অনুরূপভাবে ইতিকাফকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং

ক্ষমা অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে না। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯)।

ইতিকাফের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, মসজিদে ইতিকাফ হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা ও চিত্তের নিষ্কলুষতা; চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা। ফেরেশতাদের গুণাবলি অর্জন এবং লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সব ধরনের ইবাদতের সুযোগ লাভের সর্বোত্তম উপায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর পূতঃপবিত্র বিবিগণসহ সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এই সুন্নতের ওপর আমৃত্যু আমল করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৪২)। নারীদের জন্য নিজ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করা জায়েজ, যদি পরিবারের অনুমতি থাকে।

৩.১৮.১ ইতিকাফের নিয়ম

- ইতিকাফে অবস্থানকারী মসজিদ থেকে অপ্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবেন না।
- শুধু ওযু বা প্রকৃতির প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া বৈধ।
- ইতিকাফ চলাকালে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, নামাজ ও ইস্তেগফারে সময় কাটানো উচিত।

৩.১৮.২ ইতিকাফের ফজিলত ও উপকারিতা

১. লাইলাতুল কদর পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়

লাইলাতুল কদরের মর্যাদা এত বেশি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতটি পাওয়ার জন্য শেষ দশকে আজীবন ইতেকাফ করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি কদরের রাতের সন্ধানে (রমজানের) প্রথম ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। এরপর ইতিকাফ করলাম মধ্যবর্তী ১০ দিন। তারপর আমার প্রতি ওহি নাযিল করে জানানো হলো যে, তা শেষ ১০ দিনে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের যে ইতিকাফ পছন্দ করবে, সে যেন ইতিকাফ করে। তারপর মানুষ (সাহাবায়ে কেরাম) তাঁর সঙ্গে ইতেকাফে শরিক হয় (মুসলিম শরীফ)। আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর। (সহিহ বুখারী, ২০১৯, ২০২০, মুসলিম ১৩/৪০, হাঃ ১১৬৯, আহমাদ ২৪৩৪৬), (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৮৭৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮৮৭)। ইতিকাফে থাকা ব্যক্তি এই মহামূল্যবান রাতের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হন না।

২. আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মাগফিরাত লাভ হয়

ইতিকাফকারী ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সময় কাটান, যা তাঁর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন।

৩. দুনিয়ার পাপ থেকে দূরে থাকা:

ইতিকাফের সময় গুনাহ করার সুযোগ থাকে না, ফলে বান্দা আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়। রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ একটি অত্যন্ত মহৎ ও বরকতময় আমল। এটি রোজার ইবাদতকে পূর্ণতা দেয় এবং

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উত্তম মাধ্যম। নবী ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ করতেন — তাই মুসলমানদের উচিত অন্তত জীবনে একবার হলেও রমজানের ইতিকাফে অংশ নেওয়া, যেন আল্লাহর নৈকট্য ও লাইলাতুল কদরের বরকত লাভ করা যায়।

৩.১৯ লাইলাতুল কদর — রমজানের শ্রেষ্ঠ রাত

শবে কদর অর্থ হলো মর্যাদাপূর্ণ রাত বা ভাগ্যরজনী। শবে কদরের আরবি হলো লাইলাতুল কদর তথা সম্মানিত রাত। লাইলাতুল কদরের রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত। রমজান মাসের সবচেয়ে মহান ও বরকতময় রাত হলো লাইলাতুল কদর। এটি এমন এক রাত যার মর্যাদা ও মূল্য হাজার মাসের চেয়েও বেশি। আল্লাহ তাআলা এই রাতকে এমনভাবে সম্মানিত করেছেন যে, এতে কুরআন নাজিল হয়েছে, ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়, আর মুমিন বান্দাদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের ঘোষণা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন মহিমান্বিত রাত্রিতে। আর আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রাত্রি কী? মহিমান্বিত রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সেই রাত্রে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাদের প্রতিপালকের আদেশক্রমে অবতীর্ণ হয়। সেই রাত্রি শান্তিই শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত।" (আল-কাদ্‌র ১-৫)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদ্‌রে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। (সহিহ বুখারি, ২০১৪;)

আরেক হাদিসে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌রের অনুসন্ধান কর (সহিহ বুখারি, ২০১৭) । হাদিস শরীফের ভাষায় এ মহান রজনিতে ঈমানদার ইবাদতকারীর গুনাহ মোচন করা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকির আশায় কদরের রাতে ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগবে, তার পূর্বের গুনাহ্ (সগিরা) ক্ষমা করে দেয়া হবে (সহিহ বুখারি)। নিঃসন্দেহে এ রাত্রিটি মর্যাদাপূর্ণ ও গুনাহ মাফের রাত্রি। তাই বান্দা কিভাবে আল্লাহ তাআ'লার কাছে ক্ষমা পেতে পারেন তাও রসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি 'লাইলাতুল কদর' জানতে পারি তাহলে সে রাতে কী বলব? তিনি বললেন, তুমি বল " **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي** অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি সম্মানিত ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন" (ইবনু মাজাহ, জামে তিরমিজি)। এ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ রজনিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও গুনাহ মাফের লক্ষ্যে নেক-আমলের প্রতি উদগ্রীব হয়ে পড়েন সকলেই। তবে কত তারিখ হবে এ বিশেষ রজনি? এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) হাদিসে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তা (লাইলাতুল কদর) রমযানের শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। লাইলাতুল কদর (শেষ দিক হতে) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাতে বিদ্যমান থাকে (সহিহ বুখারি)। লাইলাতুল কদর এমন এক রাত, যা মুমিনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই রাতে করা ইবাদত শুধু সওয়াব বাড়ায় না, বরং বান্দাকে পাপমুক্ত করে আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। তাই আমাদের উচিত রমজানের শেষ দশকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এই রাতের সন্ধান করা এবং এ রাতে চোখের পানি, তওবা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রব্বুল আলামীন।

রোজা ও রমজান বিষয়ক অধ্যায়ের সারাংশ:

রোজার গুরুত্ব ও ফরজ হওয়া:

রমজানের রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি
সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর রমজানের রোজা ফরজ
ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে
কুরআন-হাদিসে রোজার মর্যাদা:
রোজা তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম
রোজাদারের জন্য জান্নাতের রাইয়্যান দরজা নির্ধারিত
রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল
রোজাদারের দোয়া কবুল হয়

রোজার উদ্দেশ্য:

তাকওয়া অর্জন
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ
আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ
পাপ থেকে বিরত থাকা
ধৈর্য ও সংযম শিক্ষা
রোজার ফজিলত:
রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজে দেবেন
রোজা গুনাহ মোচন করে
রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে উত্তম
রোজা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

বিশেষ আমলসমূহ:

সাহরি: বরকতপূর্ণ ও সুন্নত
দ্রুত ইফতার: অনেক সওয়াবের কাজ
তারাবিহ: গুনাহ মাফের কারণ

কুরআন তিলাওয়াত: রমজানের বিশেষ ইবাদত

দান-সদকা: সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়

ইতিকাফ: আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম

লাইলাতুল কদর: হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত

শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা:

শারীরিক বিষমুক্ততা ও ওজন নিয়ন্ত্রণ

মানসিক প্রশান্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি

রমজান মাস তাই মুমিনের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান, যাতে আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব।

অধ্যায় ৪. রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল

৪.১ ভূমিকা

রমজান মাসের রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি মুসলিম জীবনে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনন্য মাধ্যম। তবে রোজা পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় মুসলিমদের।

এই অধ্যায়ে রোজা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে, যা একজন রোজাদারকে সঠিকভাবে রোজা পালনে সহায়তা করবে। এখানে রোজার নিয়ত থেকে শুরু করে রোজা ভঙ্গের কারণ, কাফফারা, ফিদইয়া, কাজা রোজা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রোজার নিয়ত সম্পর্কিত সূক্ষ্ম মাসআলা, রোজা ভঙ্গকারী ও না-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ, এবং আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত মাসআলাগুলো এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিধান আলোচিত হয়েছে, যা ঈদুল ফিতরের পূর্বে প্রত্যেক মুসলিমের জানা আবশ্যক।

এই মাসআলা-মাসায়েলগুলো ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে পাঠক সঠিক ও বিশুদ্ধ বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই রোজা পালন করতে সক্ষম হন।

৪.২ রোজার নিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা

১. রমজানের রোজা এবং নির্দিষ্ট মানতের রোজার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করা যাবে।

২. রমজানের কাজা, সাধারণ মানত এবং যিহারের কাফফারা রোজার নিয়ত রাতে না করলে রোজা বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, এ প্রকার রোজার জন্য শরিয়ত প্রবর্তক এর পক্ষ থেকে কোনো সময় নির্ধারিত নেই। এজন্য রোজাদারের নিয়ত দ্বারা দিনের প্রথম থেকে রোজা নির্ধারণ করতে হবে। আর নির্দিষ্টকরণ সুবহে সাদিক এর পূর্বের নিয়ত না পেলে স্থির হয় না। অতএব, এ প্রকার রোজার সুবহে সাদিকের পূর্বে থেকে নিয়ত শর্ত। এটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। কেননা প্রথম প্রকার রোজায় শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে সময় নির্ধারিত, কাজেই যখন দিনের প্রথমাংশে রোজা পাওয়া যাবে, তখন বুঝতে হবে যে, নিয়ত এই রোজার জন্যেই। আর দ্বিপ্রহরের পূর্বেকার নিয়ত দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা, রমজানের রোজা, নির্দিষ্ট মানতের রোজা ও নফল রোজার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করা যাবে। আর রমজানের কাজা, সাধারণ মানত, কাফফারা রোজার নিয়ত রাতে না করলে রোজা বিশুদ্ধ হবে না।

৪.৩ রোজার নিয়ত সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

১. নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়:

নিয়ত বলা হয় অন্তরের ইচ্ছাকে। রোজার নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়, তবে উত্তম।

২. নিয়ত কখন করা আবশ্যক:

রমজানের রোজার নিয়ত রাতে করা উত্তম। যদি কেউ রাতে নিয়ত না করে তাহলে মধ্য আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলার দেড় ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যাবে। তবে শর্ত হলো, সুবহে সাদিকের পর থেকে নিয়তের পূর্ব পর্যন্ত রোজার পরিপন্থী কোনো কাজ না করতে হবে। (ফতোয়া হিন্দিয়া: ১/১৯৫, রদ্দুল মুহতার: ৩/৩৪১)

৩. রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সেহরি খেলে নিয়ত হয়ে যাবে:

রোজার উদ্দেশ্যে সেহরি খেলে সেটাই নিয়তের জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, রাতে রোজার নিয়ত করার পর সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি করা জায়েজ আছে। (ফতোয়া হিন্দিয়া: ১/১৯৫, রদ্দুল মুহতার: ৩/৩৪১)

৪. পুরো রমজানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়:

পুরো রমজানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক রোজার জন্য পৃথকভাবে নিয়ত করতে হবে। কেননা প্রতিটি রোজা ভিন্ন ভিন্ন আমল। (বাদায়িউস সানায়ে: ২/২২৮, রদ্দুল মুহতার: ৩/৩৪৪)

৫. কাজা রোজার নিয়ত যেভাবে করবেন:

যদি একাধিক রমজানের রোজা কাজা হয়ে যায়, তাহলে কাজা আদায় করার সময় কোনো রমজানের রোজার কাজা আদায় করছে এটা নির্দিষ্ট করা জরুরি। তবে যদি কাজা রোজার সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয় তাহলে, জীবনের সর্বপ্রথম কাজা রোজা রাখলাম, এভাবেও নিয়ত করতে পারবে।" (আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির: ১/১১৫)

৬. নিয়ত কখন করলে ধর্তব্য হবে:

নিয়তের সময় শুরু হয় পূর্বের দিনের রাতের শুরু অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে। যেমন সোমবারের রোজার নিয়ত রোববারের সূর্যাস্তের পর করা যাবে। এর আগে নিয়ত করলে রোজা সহিহ হবে না।' (রদ্দুল মুহতার: ৩/৩৪১)

৭. কোনো কোনো রোজার নিয়ত রাতে করতে হয়:

১. রমজানের কাজা রোজা।
২. অনির্দিষ্ট মানতের রোজা।
৩. বিভিন্ন কাফফারার রোজা এবং
৪. যেই নফল রোজা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

এসব রোজার নিয়ত রাতে করা আবশ্যক; সুবহে সাদিকের পর করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.৪ রোজার সময় সীমা

রোজার সময় সীমা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে রোজাদারকে সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَي الَّيْلِ ۚ

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের মধ্যে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগমন পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, রোজার প্রথম ওয়াক্ত দিনের সূচনা থেকে আরম্ভ হয়ে শেষ ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে।

৪.৫ সাহরীর মাসায়েল

- ❖ সাহরী খাওয়া জরুরী নয় তবে সাহরী খাওয়া সুন্নাত, অনেক ফযীলতের আমল, তাই ক্ষুধা না লাগলে বা খেতে ইচ্ছে না করলেও সাহরীর ফযীলত হাছিল করার নিয়তে যা-ই হোক কিছু পানাহার করে নিবে।
- ❖ নিদ্রার কারণে সাহরী খেতে না পারলেও রোজা রাখতে হবে। সাহরী না খেতে পারায় রোজা না রাখা অত্যন্ত পাপ।
- ❖ সাহরী-র সময় আছে বা নেই নিয়ে সন্দেহ হলে সাহরী না খাওয়া উচিত। এরূপ সময়ে খেলে রোজা কাযা করা ভাল। আর যদি পরে নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরীর সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব।
- ❖ সাহরীর সময় আছে মনে করে পানাহার করল অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরীর সময় ছিল না, তাহলে রোজা হবে না; তবে সারাদিন তাকে রোজাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং রমযানের পর ঐ দিনের রোজা কাযা করতে হবে।
- ❖ বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সাহরী করার ফযীলত অর্জিত হবে।

৪.৬ ইফতার-এর মাসায়েল

- ❖ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ।
- ❖ মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা ভাল। মেঘের দিনে ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত সবর করা ভাল। শুধু ঘড়ি বা আযানের উপর নির্ভর করা ভাল নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে পারে।
- ❖ সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত ইফতার করা দূরস্ত নয়।
- ❖ সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার করা, তারপর কোনো মিষ্ট জিনিস দ্বারা, তারপর পানি দ্বারা।
- ❖ লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম-এই আকীদা ভুল।
- ❖ ইফতার করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে। দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ -

- ❖ ইফতার করার পর নিম্নের দুআ পাঠ করবে-

ذَهَبَ الظَّمَآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنَ شَآءَ الله .

- ইফতার-এর সময় দুআ কবুল হয়, তাই ইফতারের পূর্বে বা কিছু ইফতার করে বা ইফতার থেকে সম্পূর্ণ ফারিগ হয়ে দুআ করা মুস্তাহাব। (**جواہر الفتاوی جرا**)
- পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যাস্ত ঘটলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ ঘন্টার মধ্যেও সূর্যাস্ত না ঘটলে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে নিবে। (**احسن الفتادی جد**/২)
- পূর্ব দিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সূর্যাস্ত পাবে তখনই ইফতার করবে।

৪.৭ যে সব কারণে রোজা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না

১। মিসওয়াক করা। যে কোনো সময় হোক, কাঁচা হোক বা শুষ্ক।

২। শরীর বা মাথা বা দাড়ি গোঁপে তেল লাগানো।

৩। চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ঔষধ দেওয়া। (আহসানুল ফাতাওয়া)

৪। খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেওয়া।

৫। ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বা স্ত্রী সম্ভোগ করা।

৬। গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা বারবার কুলি করা।

৭। অনিচ্ছা বশতঃ গলার মধ্যে ধোঁয়া, ধুলাবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা।

৮। কানে পানি দেওয়া বা অনিচ্ছাবশত চলে যাওয়ার কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোজা কাযা করে নেওয়া। (**جواہر العناوی**)

৯। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া। ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরূহ হয় না, তবে এরূপ করা ঠিক নয়।

১০। স্বপ্ন দোষ হওয়া।

১১। মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা।

১২। যে কোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা লাগানো। (**جواہر الفتاوی**) তবে রোজার কষ্ট যেন বোধ না হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো মাকরূহ। (**جواہر الفتاوی**)

১৩। রোজা অবস্থায় দাঁত উঠালে এবং রক্ত পেটে না গেলে।

১৪। পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং গালার মধ্যে যায় তার কারণে। (**فتاوی رحمۃ ج**/ ৩)

১৫। সাপ ইত্যাদিতে দংশন করলে। (**فتاوی محمودیۃ ج** / ৩)

১৬। পান খাওয়ার পর ভালভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায়।

১৭। শাহওয়াতের সঙ্গে শুধু নজর করার কারণেই যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোজা ফাসেদ হয় না।

১৮। রোজা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত বের করলে রোজা ভাঙ্গে না এবং এতে রোজা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মত দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে মাকরূহও হয় না। (**احسن الفتاوی** ৪ **جر**)

১৯। কেউ মৃত ব্যক্তি বা পশুর সাথে যৌন কাজ করলে অথবা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র যৌন সম্ভোগ করলে কিংবা স্ত্রীকে চুমু খেলে, কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করলে যদি তার বীর্যপাত না হয় তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। (কিতাবুল ফিকহ)

৪.৮ যে সব কারণে রোজা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায়

১। বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো।

২। তরকারী ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলা দেওয়া। তবে কোনো চাকরের মুনিব বা কোনো নারীর স্বামী বদ মেজাজী হলে জিহবার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ চেখে তা ফেলে দিলে এতটুকুর অবকাশ আছে।

৩। কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা টুথপেষ্ট ব্যবহার করা মাকরূহ। আর এর কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে চলে গেলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪। গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন অতিবাহিত করা।

৫। কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া। (1/ **جواہر الفتاوی جه**)

৬। গীবত করা, চোগলখুরী করা, অনর্থক কথাবার্তা বলা, মিথ্যা বলা। রোজা অবস্থায় গীবত বা পরনিন্দা-পরচর্চা করলে, গালি-গালাজ করলে, টিভি-সিনেমা ইত্যাদি দেখলে, গান-বাদ্য শ্রবণ করলে এবং যে কোনো বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়। এ কাজগুলো সর্বাবস্থায়ই হারাম, তা তো বলাই বাহুল্য।

এ বিষয়ে হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখে তখন সে যেনো অশালীন কথাবার্তা না বলে ও হৈচৈ না করে।" (সহিহ বুখারী, ১৯০৪)

আবু দাউদ শরিফে রেওয়ায়েতে এ শব্দ রয়েছে, "রোজাদার যেনো কোনো অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত না হয়।" (আবু দাউদ, ৩৩৬৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা-প্রতারণা ও গুনাহের কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহ তাআলার নিকট তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো মূল্য নেই।" (সহিহ বুখারী, ১৯০৩)

৭। কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেয়ার সময় ওপরের দিকে পানি পৌঁছানো বা টেনে নেয়া মাকরুহ। হযরত লাকিত ইবনে সবিরা রা. থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "নাকে পানি দেওয়ার সময় ভালোভাবে নাকে পানি দাও, তবে রোজাদার হলে নয়।" (জামে তিরমিজি, ৭৬৬)

৮। ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।

৯। মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে ফেলা।

১০। দাঁতে ছোলা বুটের চেয়ে ছোট কোনো বস্তু আটকে থাকলে তা বের করে মুখের ভিতর থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা।

১১। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না- এরূপ মনে হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে ক্ষতি নেই, তবে যুবকদের এহেন অবস্থা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আর রোজা অবস্থায় স্ত্রীর ঠোট মুখে নেওয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

১২। নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোনো বস্তু শিশুর মুখে দেওয়া। তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই।

১৩। পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশী ধৌত করা যে, ভিতরে পানি পৌঁছে যাওয়ার সন্দেহ হয়- এরূপ করা মাকরূহ। আর প্রকৃতপক্ষে পানি পৌঁছে গেলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ জন্য রোজা অবস্থায় পানি দ্বারা ধৌত করার পর কোনো কাপড় দ্বারা বা হাত দ্বারা পানি পরিষ্কার করে ফেলা নিয়ম।

১৪। ঠোটে লিপিষ্টিক লাগালে যদি মুখের ভিতর চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তা মাকরূহ।

১৫। অনেকে দাঁতের ব্যথা দূর করার জন্য গুল দিয়ে দাঁত মাজে আবার কেউ কেউ দাঁতের মাড়িতে গুল রেখে দেয়। গুলের মধ্যে এক প্রকার স্বাদ বা ঝাঁজ আছে। অত্যাধিক প্রয়োজন ছাড়া তা ব্যবহার করা মাকরুহ হবে। অপারগতার সময় ব্যবহার করা যাবে। তবে যদি মুখের লালা বা থুথুর সঙ্গে গুলের কিছু অংশ পেটে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।" (ফতোয়ায়ে কাজিখান: ১/২০৪, ফতোয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৯, আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৮৮-৪৮৯, ইমদাদুল ফতোয়া: ২/১৩৭, ফতোয়ায়ে হক্কানি: ৪/১৬৭)

৪.৯ যে সব কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

১। কানে বা নাকে ঔষধ দিলে।
২। ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প বমি আসার পর তা গিলে ফেললে।
৩। কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালীতে পানি চলে গেলে।
৪। স্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ প্রভৃতি করার কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে।
৫। এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, ফলের আর্টি, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি।
৬। বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা সেবন করলে।
৭। আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা হলকে পৌছালে।
৮। ভুলে পানাহার করার পর রোজা ভেঙ্গে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করলে।
৯। রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে সাহরী খেলে।
১০। ইফতারীর সময় হয়নি, দিন রয়ে গেছে অথচ সময় হয়ে গেছে- এই মনে করে ইফতার করলে।
১১। দুপুরের পরে রোজার নিয়ত করলে।
১২। দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশী হয় এবং কণ্ঠনালীর নিচে চলে যায়।
১৩। কেউ জোরপূর্বক রোজাদারের মুখে কোনো কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে।
১৪। দাঁতে কোনো খাদ্য-টুকরা আঁটকে ছিল এবং সুবহে সাদিকের পর তা যদি পেটে চলে যায় তবে সে টুকরা ছোলা বুটের চেয়ে ছোট হলে রোজা ভেঙ্গে যায় না, তবে এরূপ করা মাকরূহ। কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর গিলে ফেললে তা যতই ছোট হোক না কেন রোজা কাযা করতে হবে। (আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, পৃঃ ১/২০৬-২১১)
১৫। হস্ত মৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয়।
১৬। পেশাবের রাস্তায় বা মেয়েলোকের যোনিতে কোনো ঔষধ প্রবেশ করালে।
১৭। পানি বা তেল দ্বারা ভিজা আঙ্গুল যোনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে।
১৮। শুকনো আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পুরোটা বা কিছুটা বের করে আবার প্রবেশ করালে। আর যদি শুকনো আঙ্গুল একবার প্রবেশ করিয়ে একবারেই পুরোটা বের করে নেয়- আবার প্রবেশ না করায়, তাহলে রোজার অসুবিধা হয় না।
১৯। মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদেক হয়ে গেলে।
২০। নস্যি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে।
২১। কেউ রোজার নিয়তই যদি না করে তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

২২। স্ত্রীর বেহুঁশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে ঐ স্ত্রীর উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
২৩। রমযান ব্যতীত অন্য নফল রোজা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

৪.১০ যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

রোজা রাখতে অপারগ ব্যক্তির জন্য শর্ত সাপেক্ষে অব্যহতির সুযোগ রয়েছে। তবে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙে ফেলবে বা নষ্ট করবে, তাদের জন্য রোজার কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। যেসব কাজে রোজার কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৪.১০.১ দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসঃ

রোজা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে, চাই তাতে বীর্যপাত হোক আর না হোক। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর কাজা ও কাফফারা আবশ্যক হবে। হাদিসে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন, রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল সা. তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আজাদ করো। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজি সা. বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল সা. বললেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৬৭১, মুসনাদে আহমাদ। ৬৯৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার: ১১০৭, সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৯৪৯, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৩৫২৭) । মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "বিশ্বনবী ঐ ব্যক্তিকে (যে স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক) ।
তবে রোজার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসে কোনো বাঁধা নেই। আর তাতে রোজার কোনো ক্ষতিও হবে না। স্ত্রী রাজি না থাকা অবস্থায় জোরপূর্বক যদি স্বামী সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীর রোজা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তার উপর শুধু পরবর্তীতে কাজা রাখা আবশ্যক হবে কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু স্বামীর উপর কাজা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে।

৪.১০.২ পানাহারঃ

ইসলামি শরিয়তের ওজর ব্যতীত দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করলে ওই ব্যক্তির ওপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি রমজানে রোজা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করলো। বিশ্বনবী সা: তাকে আদেশ করলেন, "সে যেন একজন দাস আজাদ করে দেয় অথবা দুই মাস (একাধারে) রোজা রাখে কিংবা ৬০ জন মিসকিনকে (দু'বেলা) খাবার খাওয়ায় (দারাকুতনি)।
ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "রমজানে রোজা রেখে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে; তার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারীর অনুরূপ।" অর্থাৎ তাকে কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। হাদিস শরীফে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো ওজর বা অসুস্থতা ছাড়া রমজানের একটি রোজা পরিত্যাগ করবে, সে যদি ওই রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখে, তবুও ওই এক রোজার ক্ষতিপূরণ হবে না (জামে তিরমিজি: ৭২৩) ।

৪.১০.৩ ধূমপানঃ

বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা পান করলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং এ কাজে কাজা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।

৪.১০.৪ সেহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করেঃ

সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আজান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি, এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খাওয়া-দাওয়া করে অথবা স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয়। এতে ওই ব্যক্তির রোজা বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি কেউ রোজার নিয়ত করার পর এমনটি করে থাকে, তবে তাদের জন্য কাজা-কাফফারা দুটোই জরুরি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছো। তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন, তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো; যতক্ষণ সকালের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপর রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করো এবং তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এ সবের ধারে কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ মানব জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করে থাকেন; হয়তো তরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। " (সূরা বাকারা: ১৮৭)

৪.১১ রমজানের কাজা আদায়ের বিধান

রমজানের কাজা রোজা আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সে ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথকভাবেও আদায় করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে লাগাতারও আদায় করতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, **فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.(البقرة:** 184। অর্থাৎ "অন্যান্য দিনে তা আদায় করবে।" এতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই। তবে একাধারে রাখা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, যদি কারো রমজানের রোজা কাজা আদায়ের পূর্বেই পরবর্তী রমজান এসে যায়, তাহলে দ্বিতীয় রমজানের রোজা আদায় করে নিবে, কাজা পরে আদায় করবে।

১। গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর বিধানঃ

গর্ভবতী ও দুধ দানকারিণী যদি ভয় করে যে রোজা রাখলে তাদের সন্তানদের ক্ষতি হবে, তাহলে তারা বোজা ভঙ্গ করতে পারবে, পরে কাজা আদায় করবে। এতে তাদের ফিদিয়া বা কাফফারা দিতে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

َإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَام .

"আল্লাহ তাআলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত মাফ করে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য সিয়াম পালন না করার অবকাশ দিয়েছেন (ইবনে মাজাহ। ১৯৬৭, তিরমিযী। ৭১৫)।

২। অতি বৃদ্ধের রোজার হুকুম:

شيخ فاني অর্থ: এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে চলাফেরা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যদি রোজা রাখতে না পারে, তবে সে রোজা ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্য খাওয়াবে বা তার দাম দিয়ে দিবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ (سورة البقرة: 184)

অর্থাৎ, যারা বার্ধক্যের কারণে অক্ষম তারা একজন মিসকিনকে খাদ্য দিবে। এখানে **يُطِيقُونَه** এর অর্থ **شيخ فاني** তবে **لا يُطِيقُونَه** যদি পরবর্তীতে কাজা করতে সক্ষম হয়, তাহলে কাজাই করতে হবে।

৩। যে অবস্থায় ব্যক্তির ওপর রোজার বিধান অর্পিত হয় না:

চির উন্মাদ বা বদ্ধ পাগল যার আরোগ্য লাভের কোনো আশা নেই, এরূপ উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পর তার উপর থেকে রোজার ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সে অসুস্থ ও মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার দরুন শরিয়তের বাধ্যনুগত থাকার গণ্ডি বহির্ভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে রোজা না রাখার কারণে গুনাহগার হবে না; বরং তখন তার উপর থেকে রোজার ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে। এমনকি তার সম্পদ থেকে কারো ওপর তার পক্ষে কাফফারা বা ফিদিয়া দান করাও ওয়াজিব হবে না।

৪। ফিদিয়া দানের অসিয়ত করলে তার হুকুম:

যদি কারো উপর রোজার কাজা থেকে যায়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, এভাবে মৃত্যু মুখে যদি সে রোজার ফিদিয়া দানের জন্য অসিয়ত করে যায়, তাহলে তার সম্পদ হতে ফিদিয়া আদায় করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব। আর যদি অসিয়ত না করে তবে আদায় করা মুস্তাহাব। যে পরিমাণ সম্পদে অসিয়ত করা যায়: সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়ত করা জায়েজ। এর চেয়ে বেশি অসিয়ত করা জায়েজ নয়। তবে যদি অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদেও অসিয়ত অনুমোদন করে, তাহলে সে অসিয়ত বৈধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ওয়ারিশরা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।" (সহিহ বুখারী, ৫৬৬৮)। উল্লেখ্য যে, কোনো ওয়ারিশ যদি নাবালেগ হয়, তাহলে তার অংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক গ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না।

৫। রমজানের দিনে নাবালেগ বালেগ হলে এবং কাফের মুসলমান হলে তার বিধান:

রমজানের দিনের বেলায় কোনো নাবালেগ বালেগ হলে কিংবা কোনো কাফের মুসলমান হলে, তার অবশিষ্ট দিন পানাহার হতে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরের দিন হতে রোজা রাখতে হবে। আর পূর্ববর্তী দিবসের কোনো কাজা করতে হবে না। কেননা, ইতিপূর্বে তাদের উপর রোজা ফরজ হবার উপযোগিতা ছিলো না, তাই উক্ত দিনগুলোর কাজাও ওয়াজিব হবে না। আর সেদিনের অবশিষ্টাংশ ও পরবর্তী দিনগুলোর রোজা এজন্য রাখতে হবে যে, মুসলমান ও বালেগ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে রোজা রাখার উপযোগিতা এসে গেছে।

৬। রমজানের দিনে মুসাফির মুকিম হলে অথবা মহিলা হায়েজ হতে পবিত্র হলে তার বিধান:

রমজানের দিবাভাগে মুসাফির মুকিম হলে এবং হায়েজ হতে রমণী পবিত্র হলে অবশিষ্টাংশ পানাহার হতে বিরত থাকবে। মুসাফির সুবহে সাদিকের পূর্ব হতে কিছু না খেলে রোজা হয়ে যাবে, আর কিছু খেয়ে থাকলে মুসাফিরের জন্য কাজা করতে হবে। আর হায়েজগ্রস্ত মহিলার জন্য পরবর্তীতে ওই রোজার কাজা করতে হবে, কারণ সে দিনের শুরু লগ্নে অপবিত্র ছিল।

৭। ইফতার ও সাহরিতে ভুলবশত আগে-পরে হলে তার বিধান:

যদি কোনো ব্যক্তি সুবহে সাদিক হয় নি মনে করে সাহরি খায়, এরপর জানতে পারল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে অথবা সূর্যাস্ত গেছে ভেবে পানাহার করার পর দেখা গেল যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাদের

ওপর সে দিনকার কাজা ওয়াজিব হবে; কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা তাদের ভুলবশত হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি।

৮। রোজা অবস্থায় হায়েজ শুরু হলে তার হুকুম:

রোজা পালনকারী নারীর যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগেও হায়েজ দেখা দেয়, তা হলে তার ওই দিনের রোজা বাতিল হয়ে যাবে। পরে রোজাটি কাজা করতে হবে।

৯। রমজান মাসে ঔষধ খেয়ে হায়েজ বন্ধ রাখার হুকুম:

প্রতি মাসে মহিলাদের হায়েজ হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। এটি আল্লাহ তাআলার নেজাম। রমজানে এটিকে বন্ধ করে রাখা উচিত হবে না। এতে শারিরীকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে যদি কেউ ঔষধ খেয়ে বন্ধ রাখে, তাহলে তা তার জন্য জায়েজ আছে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু হায়েজের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন, তাই সে সময় হায়েজ স্বাভাবিক রেখে রোজা না রাখলে কোনো সমস্যা নেই। পরে তা কাজা করে নিবে। তবে যদি কোনো মহিলা রমজান আসার আগেই এবং হায়েজ শুরু হওয়ার আগে ঔষধ খেয়ে তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তার জন্য রোজা রাখতে হবে। কারণ, এতে করে তার উপর রোজা না রাখার কোনো কারণ বিদ্যমান থাকছে না। তাই তার জন্য রোজা রাখা আবশ্যক হবে।
কিন্তু যদি রমজান চলে আসে, আর হায়েজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে দেয়, তাহলে হায়েজের সর্বনিম্ন সীমা কমপক্ষে ৩ দিন পর্যন্ত রোজা রাখতে পারবে না। এরপর থেকে রোজা রাখা আবশ্যক, যেহেতু হায়েজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর হায়েজ শুরু হলে এর সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো তিন দিন। তাই হায়েজ শুরু হতেই ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে ফেললেও ধরা হবে হায়েজ জারি আছে তিনদিন পর্যন্ত। তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে হিসেবে রোজা রাখা আবশ্যক (কিতাবুল ফতোয়া: ৩/৪০৫) ।

১০। একাধিক রোজা বিনা ওজরে ভেঙে ফেললে তার হুকুম:

একাধিক রোজা বিনা ওজরে ভেঙে ফেললে সেগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফফারা আদায় করা লাগবে না। তবে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে রোজা কাজা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, শরয়ী ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত রমযানের রোজা ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় গুনাহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّه.

"যে ব্যক্তি সফর বা অসুস্থতা ছাড়া রমযানের একটি রোজাও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিবে, সে পুরো জীবন রোজা রাখলেও ঐ রোজার হক আদায় হবে না। " (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা। ১৮৯৩, কিতাবুল আছল: ২/১৫৩; আলমাবসূত, সারাখসী: ৩/৭৫; ফতোয়া বায্যাযিয়া: ১/১০৩; মারাকিল ফালাহ পৃ. ৩৬৭; আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪১৩)

৪.১২ যে সব কারণে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে

১। যদি কেউ শরীআতসম্মত সফরে থাকে, তাহলে তার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে; পরে কাযা করে নিতে হবে। কিন্তু সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে রোজা রাখাই উত্তম। আর যদি কোনো ব্যক্তি রোজা রাখার নিয়ত করার পর সফর শুরু করে, তাহলে সে দিনের রোজা রাখা জরুরী।

২। কোনো রোগী ব্যক্তি রোজা রাখলে যদি তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা অন্য কোনো নতুন রোগ দেখা দেওয়ার আশংকা হয় অথবা রোগ মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে রোজা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছাড়তে হলে কোনো দ্বীনদার-পরহেযগার চিকিৎসকের পরামর্শ থাকা শর্ত, কিংবা নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে, শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হয়ে আশংকাবোধ করে রোজা ছাড়া দুরস্ত হবে না। তাহলে কাযা কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। (বেহেশতী জেওর)

৩। রোগ মুক্তির পর যে দুর্বলতা থাকে তখন রোজা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা হয় তাহলে তখন রোজা না রাখার অনুমতি আছে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৪। গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রী লোক রোজা রাখলে যদি নিজের জীবনের ব্যাপারে বা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে বা রোজা রাখলে দুধ শুকিয়ে যাবে আর সন্তানের সমূহ কষ্ট হবে- এরূপ নিশ্চিত হলে তার জন্য তখন রোজা ছাড়া জায়েয আছে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৫। হায়য নিফাস অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে।

৪.১৩ যে সব কারণে রোজা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে

১। যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের আশংকা দেখা দেয়।

* উল্লেখ্য, কেউ যদি অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো কাজ করতে পারে তা সত্ত্বেও সে টাকার লোভে রোদে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল কিংবা বিনা অপারগতায় আগুনের কাছে যাওয়ার কারণে পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার জন্য রোজা ছাড়ার অনুমতি নেই।

২। যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় যে, ওষুধ-পত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয়।

৩। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়।

৪। বেহুঁশ বা পাগল হয়ে গেলে।

*উল্লেখ্য যে, এসব অবস্থায় যে রোজা ছেড়ে দেওয়া হবে তার কাযা করে নিতে হবে।

৪.১৪ রমযান মাসের সম্মান রক্ষার মাসায়েল

- ❖ রমযান মাসে দিনের বেলায় লোকদের পানাহারের উদ্দেশ্যে হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতি খাবার দোকান খোলা রাখা রমযানের অবমাননা বিধায় তা পাপ। অন্য ধর্মাবলম্বী বা মা'যূর ব্যক্তিদের খাতিরে খোলা রাখার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। (فتاوى رحيميه ج/٢)
- ❖ কোনো কারণবশত রোজা ভেঙ্গে গেলেও বাকী দিনটুকু পানাহার পরিত্যাগ করে রোযাদারের ন্যায় থাকা ওয়াজিব। (বেহেশতী জেওর)
- ❖ দুর্ভাগ্যবশত কেউ যদি রোজা না রাখে তবুও অন্যের সামনে পানাহার করা বা প্রকাশ করা যে, আমি রোজা রাখিনি- এতে দ্বিগুণ পাপ হয়, প্রথম হল রোজা না রাখার পাপ, দ্বিতীয় হল গোনাহ প্রকাশ করার পাপ।

৪.১৫ রোজার কাযার মাসায়েল

- ❖ রমযানের রোজা কাযা হয়ে গেলে রমযানের পর যথাশীঘ্র কাযা করে নিতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোজা রাখতে দেরী করা গোনাহ।
- ❖ কাযা রোজার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে, অন্যথায় কাযা রোজা সহীহ হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে সে রোযা নফল হয়ে যাবে।
- ❖ ঘটনাক্রমে একাধিক রমযানের কাযা রোজা একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোজা আদায় করছি।
- ❖ যে কয়টি রোজা কাযা হয়েছে তা একাধারে রাখা মুস্তাহাব। বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত আছে।
- ❖ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রমযান এসে গেলে তখন ঐ রমযানের রোজাই রাখতে হবে। কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে।

৪.১৬ কাফফারার বিধান

* রোজার কাফফারা যিহারের কাফফারার মত। যিহারের কাফফারা হলো,

১. একটি দাস আজাদ করা।

২. অথবা ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখা।

৩. অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু বেলা আহার করানো।

কাফফারা হলো, লাগাতার ষাট দিন রোজা রাখতে হবে। মাঝখানে একদিনও কাজা করা যাবে না। কাজা হলে আবার প্রথম থেকে ষাটটি রাখতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি রোজা রাখতে না পারে বয়সের কারণে বা অসুস্থ্যতার কারণে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াতে হবে। একদিনের খানা সদকায়ে ফিতির পরিমাণ টাকা। রোজা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি মিসকিনকে খানা খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো। সে বললো, আমি রমযানের রোযারত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি একটি গোলাম আযাদ করো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্য নেই। তিনি বলেন, তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম রাখো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নেই। তিনি বলেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নেই। তিনি বলেন, তুমি বসো। অতএব সে বসে থাকলো। ইতোমধ্যে এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি বলেন, যাও এটা দান করে দাও। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! মদীনার দু' কংকরময় প্রান্তরের মাঝে আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। তিনি বললেন, যাও, এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।" (১৪. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬৯৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার: ১১০৭, সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৯৪৯, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৩৫২৭)

- ❖ কাফফারার রোজা এমন দিন থেকে শুরু করবে যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য, যে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম তা হল দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন।
- ❖ কাফ্ফারার রোজা রাখার মধ্যে হায়েযের দিন (নেফাসের নয়) এসে গেলেও যে কয়দিন সে হায়েযের কারণে বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই।
- ❖ কাযা রোজার ন্যায় কাফফারার রোজার নিয়তও সুবহে সাদেকের পূর্বে হওয়া জরুরী।
- ❖ একই রমযানের একাধিক রোজা ছুটে গেল কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে। দুই রমযানের ছুটে গেলে দুই কাফফারা ওয়াজিব হবে।
- ❖ কাফ্ফারা বাবত বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোজা রাখার সামর্থ না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে- এমন ৬০ জন মিসকীনকে (অথবা এক জনকে ৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াতে হবে অথবা সদকায়ে ফিত্র-য়ে যে পরিমাণ গম বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে পরিমাণ দিতে হবে। এই গম ইত্যাদি বা মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা একদিনেই দিয়ে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। তাতে মাত্র এক দিনের কাফ্ফারা ধরা হবে।
- ❖ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার মাঝে ২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই।

৪.১৭ রোজার ফিদইয়ার মাসায়েল

- ❖ "ফিদইয়া" (**فدية**) অর্থ ক্ষতিপূরণ। রোজা রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাকে ফিদইয়া বলে। প্রতিটা রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক রোজার ফিদইয়া।
- ❖ যার যিম্মায় কাযা রোজা রয়ে গেছে- জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছগণ তার রোজার ফিদইয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি ওয়াছিয়্যাত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ফিদইয়া আদায় করা হবে। আর ওয়াছিয়্যাত না করে থাকলেও যদি ওয়ারিছগণ নিজেদের মাল থেকে ফিদইয়া আদায় করে দেয় তবুও আশা করা যায় আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।
- ❖ অতি বৃদ্ধ/বৃদ্ধা রোজা রাখতে না পারলে অথবা কোনো ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদী রোগ হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোজা রাখায় ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে ফিদইয়া আদায় করার অনুমতি আছে। তবে এরূপ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা এরূপ রোগী পুনরায় কখনও রোজা রাখার শক্তি পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদইয়া দান করেছিল তার ছওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে।

৪.১৮ মানতের রোজার মাসায়েল

- ❖ যদি কেউ আল্লাহর নামে রোজা রাখার মানত করে তাহলে সেই রোজা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোনো শর্তের ভিত্তিতে মানত মানলে সেই শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না- শর্ত পূরণ হলেই ওয়াজিব হয়।
- ❖ কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার মান্নত করলে এবং সেই দিন রোজা রাখলে রাত্রেই নিয়ত করা জরুরী নয়, দুপুরের এক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

- ❖ কোনো নির্দিষ্ট দিনের রোজা রাখার মানত করলে এবং সেই দিন সে রোজা রাখলে মানতের রোজা বলে নিয়ত করুক বা শুধু রোজা বলে নিয়ত করুক বা নফল বলে নিয়ত করুক মানতের রোজাই আদায় হবে। তবে কাজা রোজার নিয়ত করলে কাযাই আদায় হবে- মানতের রোজা আদায় হবে না।
- ❖ কোনো দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মানত না করলে যে কোনো দিন সে মানতের রোজা রাখা যায়। এরূপ মানতের রোজার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বেই হওয়া শর্ত।
- ❖ কোনো নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট মাসে রোজা রাখার মানত করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে বা মাসে রোজা রাখাই জরুরী নয়-অন্য যে কোনো সময় রাখলেও চলবে।
- ❖ যদি এক মাস রোযা রাখার মানত করে তাহলে পুরো এক মাস লাগাতার রোজা রাখতে হবে।
- ❖ যদি কয়েক দিন রোজা রাখার মানত করে তাহলে একত্রে রাখার নিয়ত না থাকলে সে কয়দিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখলেও চলবে। আর একত্রে রাখার নিয়ত করলে একত্রেই রাখতে হবে।

৪.১৯ নফল রোজার মাসায়েল

- ❖ পাঁচদিন ব্যতীত সারা বৎসর যে কোনো দিন নফল রোজা রাখা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল- দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযাহার পরের তিন দিন অর্থাৎ, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহজ্জ। এই পাঁচ দিন যে কোনো রোজা রাখা হারাম।
- ❖ যে ব্যক্তি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই, ও ১৫ই তারিখে নফল রোজা রাখল, সে যেন সারা বৎসর রোজা রাখল। এটাকে 'আইয়্যামে বীযের রোজা' বলে।
- ❖ প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল রোজা রাখতেন। এতেও অনেক সওয়াব রয়েছে।
- ❖ বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোজার নিয়ত করা দুরস্ত আছে।
- ❖ নফল রোজা শুরু করলে সেটা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই নফল রোজার নিয়ত করার পর সেটা ভাঙ্গলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।
- ❖ স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর জন্য নফল রোজা রাখা দুরস্ত নয়। রাখলে স্বামী হুকুম করলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং পরে কাযা করে নিতে হবে।
- ❖ মেহমান যদি একা খেতে মনে কষ্ট পায়, তাহলে তার খাতিরে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) নফল রোজা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ভাঙলে পরে কাযা করে নিতে হবে। তবে এই ভাঙ্গার অনুমতি সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত। (الرعاية عمدة)

৪.২০ রোজা সংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল

১. মস্তিষ্ক অপারেশন: রোজা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও মস্তিষ্কে কোনো তরল কিংবা শক্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা, মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোনো ছিদ্র ও পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোনো কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। পূর্ব যুগে ছিদ্র ও পথ আছে ধারণা করেই এতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

২. কানে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার: কানে ড্রপ, ওষুধ, তেল ও পানি ইত্যাদি দিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ, কান থেকে গলা পর্যন্ত কোনো রাস্তা নেই। আদি যুগে ছিদ্র পথ আছে বলে ধারণা করা হতো বিধায় সে যুগের কিতাবাদিতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩. চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার: চোখে ড্রপ, সুরমা ও মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয়। কারণ চোখে কিছু দিলে রোজা না ভাঙ্গার কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার: নাকে ড্রপ, পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ, নাক রোজা ভঙ্গ হবার গ্রহণযোগ্য রাস্তা। নাকে ড্রপ ইত্যাদি দিলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৫. অক্সিজেন (Oxygen) ব্যবহার: নাকে অক্সিজেন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ, অক্সিজেন দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু নয়। রোজা ভঙ্গ হতে হলে দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু দেহের অভ্যন্তরের গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে হয়।

৬. মুখে ওষুধ ব্যবহার: মুখে কোনো ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে রোজা ভেঙ্গে যাবে, চাই তা যতই অল্প হোক।

৭. রক্ত দেয়া ও নেয়া: রক্ত দিলে অথবা নিলে কোনো অবস্থাতেই রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলে তো কোনো বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢোকেনি, তাই এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর রক্ত নিলে যদিও তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। তেমনিভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না বিধায় এতে রোজা ভঙ্গ হবে না।

(উপরোক্ত আধুনিক মাসয়ালাগুলি নেয়া হয়েছে "ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা" নামক বই থেকে যার লেখক: মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন)

৪.২১ সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) সংক্রান্ত মাসআলা

সাদাকাতুল ফিতর, যা সংক্ষেপে ফিতরা নামে পরিচিত, হলো রমজান মাস শেষে ঈদুল ফিতরের দিন আদায় করা ওয়াজিব একটি দান। এটি মূলত রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ, রোজাদারকে পবিত্র করা এবং ঈদের খুশিতে সমাজের দরিদ্র-অসহায় মানুষদের সামিল করার একটি বিধান। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন রোজাদারকে অনর্থক ও অশ্লীল কথা ও কাজ হতে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাদ্য যোগানোর জন্য।” (সুনানে আবু দাউদ, ১৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮২৭)

১. ফিতরা কার উপর ওয়াজিব?

ফিতরা হলো ব্যক্তির নিজের ও তার পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে আদায় করা আবশ্যকীয় ইবাদত। প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান নারী-পুরুষের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব, যদি তার কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাদ্য এবং মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ (যা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান) অতিরিক্ত থাকে (ফতোয়ায়ে শামী বা রদ্দুল মুহতার, ২/৩৬১)। নিজেকে ছাড়াও তার নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪/১৯২) । স্ত্রী ও বালেগ সন্তানদের ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নয়, তবে স্বামী বা পিতা যদি তাদের অনুমতি নিয়ে খুশি মনে আদায় করে দেন, তবে তা জায়েয।

২. ফিতরা আদায়ের সময়

ফিতরা আদায়ের উত্তম সময় হলো ঈদের দিন সূর্য ওঠার পর, ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে। তবে রমজানের শেষার্ধে, এমনকি ঈদের কয়েক দিন আগেও তা আদায় করা জায়েয। এতে দরিদ্ররা ঈদের আগেই তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। (সহিহ বুখারি, ১৫০৩)

ওয়াজিব হওয়ার সময়: ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিতরা ওয়াজিব হয়ে যায়।

দেরি করার বিধান: কোনো কারণে ঈদের দিন ফিতরা আদায় করতে না পারলে পরেও তা আদায় করা আবশ্যক। এতে ফিতরা মওকুফ হয়ে যায় না, বরং তা কাযা হিসেবে দ্রুত আদায় করতে হবে।

৩. ফিতরার পরিমাণ ও প্রকারভেদ

- ❖ প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। মহিলা, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন, অধীন সকলের জন্য ওয়াজিব।
- ❖ ঈদের দিনে যদি কোনো মুসলিম ও তার পরিবার বর্গের খাবারের চেয়ে এক সা (প্রায় ৩ কেজি) খাবার অতিরিক্ত থাকে, তাহলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়।
- ❖ একজন মুসলিম সে নিজের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে তেমনি নিজে যাদের ভরন-পোষণের দায়িত্ব পালন করে তাদের পক্ষ থেকেও আদায় করবে।
- ❖ ফিতরার পরিমাণ হলো মাথা পিছু এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ আটা বা কিসমিস অথবা গম।
- ❖ ফিতরা খাদ্যদ্রব্য বা তার মূল্য দিয়ে আদায় করা যায়। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ফিতরা আদায় করাই উত্তম, কারণ হাদিসে খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে।

ফিতরার পরিমাণ হলো:

১। গম বা আটা; পরিমাণ- অর্ধ সা' (Half Sa'); আধুনিক ওজন (প্রায়)- ১.৬৫ কিলোগ্রাম। (ইমাম আবু হানিফার মতে)

২। যব, খোরমা, কিশমিশ বা পনির; পরিমাণ- এক সা' (One Sa'); আধুনিক ওজন (প্রায়)- ৩.৩০০ কিলোগ্রাম।

১ সা' এর পরিমাণ প্রায় ৩.৩ কেজি। তবে সতর্কতামূলকভাবে ৩.৫ কেজি ধরা যেতে পারে।

আধুনিক হিসাবে ‘সা’ ও নিসফে ‘সা’

১ সা = ২৮০.৫০ তোলা

১ তোলা = ১১.৬৬ গ্রাম (প্রায়)

অতএব

১ সা = ৩২৭০.৬০ গ্রাম (প্রায়)

অর্থাৎ ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি।

এবং আধা সা = ১৬৩৫.৩১৫ গ্রাম বা ১.৬৩৫৩১৫ কেজি (প্রায়)

অর্থাৎ ১ কেজি ৬৩৫ গ্রামের কিছু বেশি।

[সূত্র : আওযানে শরইয়্যাহ, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. পৃ. ১৮; মেট্রিক/আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (জনসাধারণের জন্য) ১৯৮২; বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স ইনস্টিটিউশন পৃ. ৩]

হাদিসে এসেছে, ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় সকল মুসলিমের উপর এক সা’ পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা’ পরিমাণ যব দ্বারা ফিতরা ফরয করেছেন। আর তা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।” (সহিহ বুখারি, ১৫০৩)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রমযানের শেষ দিকে বসরার মিম্বারের উপর খুতবা দানকালে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন এক সা খেজুর বা যব কিংবা আধা সা গম; গোলাম-স্বাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর।

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.

(সুনানে আবু দাউদ ১/২২৯। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনে আবদুল হাদী আল হাম্বলী রাহ. বলেন, হাদীসটির সকল রাবী প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আল্লামা যাহাবী রাহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছালাবা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুদিন আগে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন। সে খুতবায় তিনি বলেছেন, তোমরা প্রতি দু’জনের পক্ষ থেকে এক সা গম অথবা ছোট-বড় প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা খেজুর বা এক সা যব প্রদান করো।

أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل أحد صغير أو كبير.

(মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৩/৩১৮। আল্লামা যাইলাঈ রাহ. বলেন, এই হাদীসটির সদন সহীহ ও শক্তিশালী।)
নগদ অর্থে আদায়: ফিকাহবিদদের মতে, হাদিসে বর্ণিত খাদ্যদ্রব্যের স্থানীয় বাজারমূল্য ধরে নগদ টাকা দিয়েও ফিতরা আদায় করা জায়েয। এতে দরিদ্রদের সুবিধা হয়। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা; আল-মুগনি, ৪/৩১৮)
বর্তমানে, ফিকাহবিদদের মতে, গমের মূল্য ধরে সেই মূল্য অনুযায়ী নগদ টাকা দিয়েও ফিতরা আদায় করা জায়েজ। নগদ অর্থের পরিমাণ গমের মূল্য ধরে নির্ধারণ করা হয়, যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও সবার জন্য আদায় করা সহজ। তবে যদি কেউ অধিক সওয়াবের আশায় কিশমিশ বা খোরমার সমপরিমাণ মূল্য ধরে ফিতরা আদায় করে, তবে তা অধিক উত্তম।

৪. ফিতরা গ্রহণের উপযুক্ত কারা?

ফিতরা সেই সকল ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে, যাদের যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়— এমন গরিব, মিসকিন, ইয়াতিম, ঋণগ্রস্ত ও অভাবী মুসলমান। ফিতরা এমন ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েয নয়, যার কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাদ্য এবং মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। ফিতরা নিজের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি বা স্বামী-স্ত্রীকে দেওয়া যাবে না। (ফতোয়ায়ে শামী, ২/৩৫৯)

৫. ফিতরা সংক্রান্ত বিশেষ মাসায়েল

ভ্রূণের বিধান: ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পূর্বে জন্ম না নেওয়া সন্তানের জন্য ফিতরা ওয়াজিব নয়। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় দিতে চায়, তবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। (আল-হিদায়া, ১/২০৩; বাদাই’উস সানাই’, ২/৭৪)

মুসাফিরের বিধান: যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় আছে, সে যেখানে ঈদ উদযাপন করছে, সেই স্থান থেকেই ফিতরা আদায় করবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৩৭২) (ওয়াজিব হওয়ার সময় যে স্থানে রয়েছে, সেখান থেকেই আদায় করতে হবে)

মৃত ব্যক্তির বিধান: ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পর যদি কেউ মারা যায়, তবে তার ফিতরা মওকুফ হয়ে যায় না; কারণ ওয়াজিব হওয়ার সময় তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে। (ফাতাওয়া-ই-আলমগীরী, ১/১৯২) (ওয়াজিব হওয়ার সময়: সুবহে সাদিক)

নবজাতকের বিধান: ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করলে তার ফিতরা ওয়াজিব নয়। কারণ ওয়াজিব হওয়ার সময় সে জন্মায়নি। (বাদাই'উস সানাই', ২/৭৪) (ওয়াজিব হওয়ার সময়: সুবহে সাদিক)

সাদাকাতুল ফিতর হলো রোজাকে ত্রুটিমুক্ত করার এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এক কার্যকর মাধ্যম। এই ইবাদত যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং আমাদের ঈদের আনন্দকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি।

সারসংক্ষেপ

রোজার প্রকারভেদ:

রমজান, নির্দিষ্ট মানত ও নফল রোজার নিয়ত সুবহে সাদিক থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত করা যায়, রমজানের কাজা, সাধারণ মানত ও কাফফারা রোজার নিয়ত রাতেই করতে হবে

নিয়তের পদ্ধতি:

নিয়ত অন্তরে করা যথেষ্ট, মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়

রোজার উদ্দেশ্যে সেহরি খাওয়াই নিয়ত হিসেবে গণ্য

প্রতি রোজার জন্য পৃথক নিয়ত

রোজার সময় সীমা

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

এই সময়ে সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা

সাহরী:

সুন্নাত, ফজীলত

বিলম্বে খাওয়া উত্তম

ইফতার:

দ্রুত করা মুস্তাহাব

খেজুর, মিষ্টি বা পানি দ্বারা শুরু করা উত্তম

বিশেষ দুআ পড়া মুস্তাহাব

রোজা ভঙ্গ না হওয়ার কারণ

মিসওয়াক, সুরমা, খুশবু, ভুলে পানাহার, অনিচ্ছাকৃত বমি, স্বপ্নদোষ, ইনজেকশন等

রোজা ভঙ্গ হওয়ার কারণ

কাজা ও কাফফারা:

কাজাঃ কানে/নাকে ওষধ, ইচ্ছাকৃত বমি, ধূমপান, রক্ত, থুতু বেশি, স্ত্রী সহবাস, ইচ্ছাকৃত পানাহার, ধূমপান।

কাফফারা: ১ গোলাম আজাদ/২ মাস রোজা/৬০ মিসকিনকে খাওয়ানো

বিশেষ অবস্থার বিধান

গর্ভবতী/স্তন্যদায়ী: শঙ্কায় রোজা ভঙ্গ করা যায়, শুধু কাজা

অতি বৃদ্ধ/অসুস্থ: ফিদইয়া (এক মিসকিনকে একদিনের খাদ্য)

মুসাফির: রোজা ভঙ্গ করা যায়, পরে কাজা必要

রোজার কাজা ও কাফফারা

কাজা: যতদিন ছুটেছে, ততদিন পরে রাখা

কাফফারা: লাগাতার ৬০ দিন রোজা অথবা ৬০ মিসকিনকে খাওয়ানো

ফিতরা

পরিমাণ: গম ১.৬৫ কেজি/খেজুর/যব ৩.৩ কেজি

সময়: ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে ঈদের নামাজের前

গ্রাহক: গরিব-মিসকিন

আধুনিক মাসায়েল

মস্তিষ্ক/চোখ/কানের অপারেশন: রোজা ভঙ্গ হয় না

নাকে ড্রপ: রোজা ভঙ্গ হয়

রক্ত দান/নেওয়া: রোজা ভঙ্গ হয় না

ইনজেকশন: রোজা ভঙ্গ হয় না

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

রমজানে প্রকাশ্যে পানাহার করা নিষিদ্ধ

রোজা ভঙ্গ হলে সারাদিন রোজাদারের মতো থাকা

দ্রুত কাজা রোজা আদায় করা

এই সারসংক্ষেপটি রোজা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধানগুলো সহজে বুঝতে সাহায্য করবে। বিস্তারিত জানার জন্য মূল অধ্যায়টি পড়ুন।

উপসংহার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য মাহে রমজান এক অতুলনীয় উপহার। আমরা এই নথিতে সিয়ামের ফরযিয়াত, এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে মাসআলা-মাসায়েল, কাযা-কাফফারা এবং ইতিকাফ, লাইলাতুল কদর ও সাদাকাতুল ফিতর-এর মতো বিশেষ ইবাদতগুলোর বিস্তারিত বিধান আলোচনা করেছি। রোজা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী ইবাদত, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহভীতি অর্জনের এক মহাতর সুযোগ। রোজার উদ্দেশ্য, ইতিহাস, শর্তাবলি, উপাদান, ফজিলত এবং সংশ্লিষ্ট ইবাদতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে—এই ইবাদত কেবল নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করাই নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরের অশুদ্ধতা দূর করার, চরিত্রে দৃঢ়তা আনার, এবং সমাজে ন্যায়, দয়া ও মানবিকতার পরিবেশ গড়ে তোলার একটি সর্বাঙ্গীণ প্রশিক্ষণব্যবস্থা। রমজান মাস কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক প্রশিক্ষণের মাস। এই মাসে প্রতিটি আমলের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে বান্দা তাক্বওয়া (আল্লাহ-ভীতি) অর্জন করে, যা সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়—রোজা সকল নবী-রাসূলের যুগে ছিল, আর ইসলামে এটি পেয়েছে পূর্ণতা, সুস্পষ্ট নিয়ম ও সুশৃঙ্খল কাঠামো। রোজার শর্তাবলি, রোজা ভঙ্গের কারণ, কাযা-কাফফারা, রমজান মাসের বিশেষ ইবাদত, তারাবীহ, লাইলাতুল কদর, দোয়ার গ্রহণযোগ্যতা, দান-সদকা ইত্যাদি বিষয়সমূহ মুসলিম জীবনে রোজার ব্যাপকতা ও গুরুত্বকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দেয়। রোজার প্রতিটি শিক্ষা মানুষকে আত্মসংযম, ধৈর্য, তাকওয়া, সহনশীলতা, সততা ও সত্যবাদিতার দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষের সামাজিক আচরণ, অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। রমজান মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ প্রশান্তি সৃষ্টি করে। দিনের রোজা থেকে রাতের তারাবীহ, ফজরের দোয়া থেকে ইফতারের মুহূর্ত—প্রতিটি ইবাদত বান্দাকে অনুভব করায় আল্লাহর রহমতের স্নিগ্ধ ছোঁয়া। রোজার মাধ্যমে বান্দা তার অভ্যন্তরীণ দুনিয়ায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে, যা সারা বছর তার জীবনে প্রভাব ফেলে। রোজা মানুষকে শেখায়— ধৈর্য মানেই ঈমানের অর্ধেক, তাকওয়া মানেই প্রকৃত সফলতা এবং আল্লাহর নৈকট্যই জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। রোজাদার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে অভাবী মানুষের প্রতি দয়া, উদারতা ও দানশীলতার মানসিকতা অর্জন করে। জাকাত, সাদকা, ফিতরা—এসব ইবাদত রমজান মাসে আরও বেশি সচল হয়, যা সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে, দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘব করে এবং সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখে। রোজার ফজিলতসমূহ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে উত্তম চরিত্র গঠনে। যে ব্যক্তি রোজাকে প্রকৃত উদ্দেশ্যে পালনের চেষ্টা করে, তার মধ্যে দয়া, নম্রতা, ধৈর্য, আত্মসংযম, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। রোজাদারের দোয়া গ্রহণযোগ্য হয়, তার গোনাহ মাফ হয়, তার আমলের মান বৃদ্ধি পায়—এগুলো বিশ্বাস তাকে আরও সচেতন ও আন্তরিক করে তোলে। রোজার যাবতীয় শিক্ষা, বিধান এবং আধ্যাত্মিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ই স্পষ্ট হয়, রোজা শুধু এক মাসের ইবাদত নয়; এটি মানুষের জীবনকে বদলে দেওয়ার একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই ইবাদতের প্রকৃত সাফল্য তখনই অর্জিত হয়, যখন রমজান শেষ হওয়ার পরও রোজার সকল শিক্ষা, তাকওয়া, সংযম, সৎ চরিত্র, দয়া, আত্মসংযম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়। রমজান আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়, আর রোজা সেই পথের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এই নথিতে বর্ণিত মাসআলা-মাসায়েলগুলো হলো সেই পবিত্র বিধান, যা রোজাদারকে সঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম পালনে সাহায্য

করে। সামান্য ভুল বা ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে এবং রোজাকে আল্লাহর দরবারে কবুল করাতে এই বিধানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিশেষে, আমাদের সবার কর্তব্য হবে— সিয়ামের মাধ্যমে অর্জিত আত্মিক ও চারিত্রিক গুণাবলীকে বছরের বাকি এগারো মাস ধরে রাখা। রমজানের শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে দৃঢ় থাকা। রোজার আলোকে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। একজন মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে রোজার উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, তবে তার জীবন আলোকিত হবে, আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি, স্থিতি, নৈতিকতা ও মানবিকতার সুমহান আদর্শ। রোজা মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জান্নাতের দিকে অগ্রসর করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার সিয়ামের (রোজা) বরকত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করার এবং হাদিস অনুযায়ী আমল করে তার ফলপ্রসূতা লাভ করার তাওফীক দান করুন।

আমীন! ইয়া রব্বুল আলামীন।

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র কুরআন:

- সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭
- সূরা আল-কদর: আয়াত ১–৫
- সূরা যুমার: আয়াত ১০
- সূরা রাদ: আয়াত ২২–২৩
- সূরা হুদ: আয়াত ১১৪

২. সহিহ হাদিস সংকলন:

- সহিহ বুখারী
- সহিহ মুসলিম
- সুনান আত-তিরমিজী
- সুনান ইবনে মাজাহ
- সুনান আন-নাসাঈ
- সুনান আবু দাউদ
- মুসনাদ আহমদ
- মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৩. ফিকহ ও ফাতাওয়া গ্রন্থ:

- আহসানুল ফাতাওয়া
- ফাতাওয়া আলমগীরি
- ফাতাওয়া তাতারখানিয়া
- ফাতাওয়া কাজী খান
- ফাতাওয়া শামী
- ফাতাওয়া রহিমিয়া
- ফাতাওয়া মাহমুদিয়া

৪. ইসলামিক গবেষক ও ব্যাখ্যাকারী:

- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)
- ইমাম আল-গাজ্জালি (রহ.)
- ইবনে তাইমিয়া (রহ.)
- ইবনে কাসীর (রহ.)
- ইমাম নববী (রহ.)
- ইমাম কুরতুবী (রহ.)
- শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমিন (রহ.)

৫. গবেষণাপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য উৎস:

- শুআবুল ইমান (বাইহাকী)
- মিশকাতুল মাসাবীহ
- রিয়াদুস সালিহিন

- ফাতহুল বারী
- তাফসীরে ইবনে কাসীর
- তাফসীরে জালালাইন
- তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন

৬. বিশেষ দিক:

- আশুরা, শবে বরাত, আইয়ামে বিজ, আরাফার রোজা, নফল রোজা সংক্রান্ত হাদিস ও ফিকহি ব্যাখ্যা
- রোজার কাফফারা, কাজা, সদকাতুল ফিতর, ইতিকাফ প্রসঙ্গ

বিস্তারিত তথ্যসূত্র

কুরআনের আয়াতসমূহ

1. **সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

2. **সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৪**

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

3. **সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫**

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

4. **সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭**

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...

5. **সূরা আল-কদর: ১-৫**

6. **সূরা যুমার: ১০**

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

7. **সূরা রাদ: ২২-২৩**

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

8. **সূরা হুদ: ১১৪**

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

হাদিসের গ্রন্থ ও নির্দিষ্ট নম্বর

সহিহাইন (বুখারী ও মুসলিম):

- ❖ যে ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমজানের সওম রাখল, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (বুখারী: ৩৮, ১৯০১, ২০০১, ২০০২, ২০০৫, ২০০৬, ৭৪৯২; মুসলিম: ৭৬০, ১০৮০, ১০৮১, ১১৫১, ১১৫৩, ১১৬৪)
- ❖ রমজান এলেই জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়। (বুখারী: ১৮৯৯; মুসলিম: ১০৭৯)
- ❖ সিয়াম ঢালস্বরূপ। (বুখারী: ১৮৯৪, ৭২৯৯; মুসলিম: ১১৫১)
- ❖ রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। (বুখারী: ১৮৯৪; মুসলিম: ১১৫১)

- ❖ জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে, যেদিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। (বুখারী: ১৮৯৬, ১৭৯৭)
- ❖ যে ব্যক্তি রমজানের পর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল। (মুসলিম: ১১৬৪)
- ❖ আরাফার দিনের রোজা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মোচন করে। (মুসলিম)
- ❖ যুবকরা যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তার যেন বিয়ে করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য রোজা রাখা উচিত। (বুখারী: ৪৭৭৯; মুসলিম: ১৪০০)

সুনান গ্রন্থসমূহ:

- **সুনান আত-তিরমিজী:** (৩৫৯৮, ৬৪১৩)
- **সুনান ইবনে মাজাহ:** (১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৮৯, ১৭১৪, ১৭৫২)
- **সুনান আন-নাসাঈ:** (২৩৭০, ২৪১৬, ২৪১৮, ২৬৪৫)
- **সুনান আবু দাউদ:** (২৪১৮)

অন্যান্য হাদিস সংকলন:

- **মুসনাদ আহমদ:** (৬৬২৬, ৮০৪৩, ৯৭১৪, ৯৯৯৯, ২২১৪০, ২৩০৭০)
- **মুয়াত্তা ইমাম মালিক:** (১০৬০)
- **সুনানুল কুবরা (বাইহাকী):** (৮৩৭৫)
- **শুআবুল ইমান (বাইহাকী):** (৩৫৯৮, ৩৮২২, ৬২০৪)
- **সহিহ ইবনে খুজাইমা:** (১৮৯৩, ১৯৮৬, ২০৬৮, ২২১২)
- **সহিহ ইবনে হিব্বান:** (৩৪২৮, ৫৬৬৫, ৬৪১৩, ৬৫২৩, ৭৪৪৮)
- **মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা:** (৯৮৭৮, ৯৮৯৩)
- **মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক:** (৭৪৭৬)
- **আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব:** (৯৮১)

ফিকহ, ফাতাওয়া ও তাফসীর গ্রন্থ

1. **ফাতাওয়া আলমগীরি**
2. **আহসানুল ফাতাওয়া**
3. **ফাতাওয়া তাতারখানিয়া**
4. **ফাতাওয়া শামী (রদ্দুল মুহতার)**
5. **ফাতাওয়া কাজী খান**
6. **ফাতহুল বারী** (ইবনে হাজার আসকালানী)
7. **তাফসীরে ইবনে কাসীর**
8. **তাফসীরে জালালাইন**
9. **তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন** (মুফতি শফি)
10. **মিশকাতুল মাসাবিহ**

ইসলামিক পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ

1. **শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)**
2. **ইমাম আল-গাজ্জালি (রহ.)**
3. **ইবনে তাইমিয়া (রহ.)**
4. **ইবনে কাসীর (রহ.)**
5. **ইমাম নববী (রহ.)**
6. **ইমাম কুরতুবী (রহ.)**
7. **শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমিন (রহ.)**
8. **শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)** (হাদিসের শ্রেণীবিভাগে)

গবেষণাপত্রে উল্লিখিত বিশেষ বিষয়ভিত্তিক উৎস

- **শবে বরাতের ফজিলত:** সুনান ইবনে মাজাহ (১৩৯০), শুআবুল ইমান (বাইহাকী), সহিহ ইবনে হিব্বান (৫৬৬৫)।
- **আশুরার রোজা:** সহিহ বুখারী (২০০১, ২০০২, ২০০৫, ২০০৬), সুনান নাসাঈ (২৩৭০)।
- **আইয়ামে বীজের রোজা:** সহিহ বুখারী (১৯৮১), সুনান তিরমিজী (৭৬০, ৭৬১, ৭৬২)।
- **নফল রোজা:** সহিহ মুসলিম (১১৫৩), সুনান নাসাঈ।
- **কাফফারা ও কাজার মাসআলা:** সহিহ বুখারী (১৯৩৭, ১৯৯০, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৮)।
- **ইতিকাফ:** সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম।

এই তালিকায় গবেষণাপত্রে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।